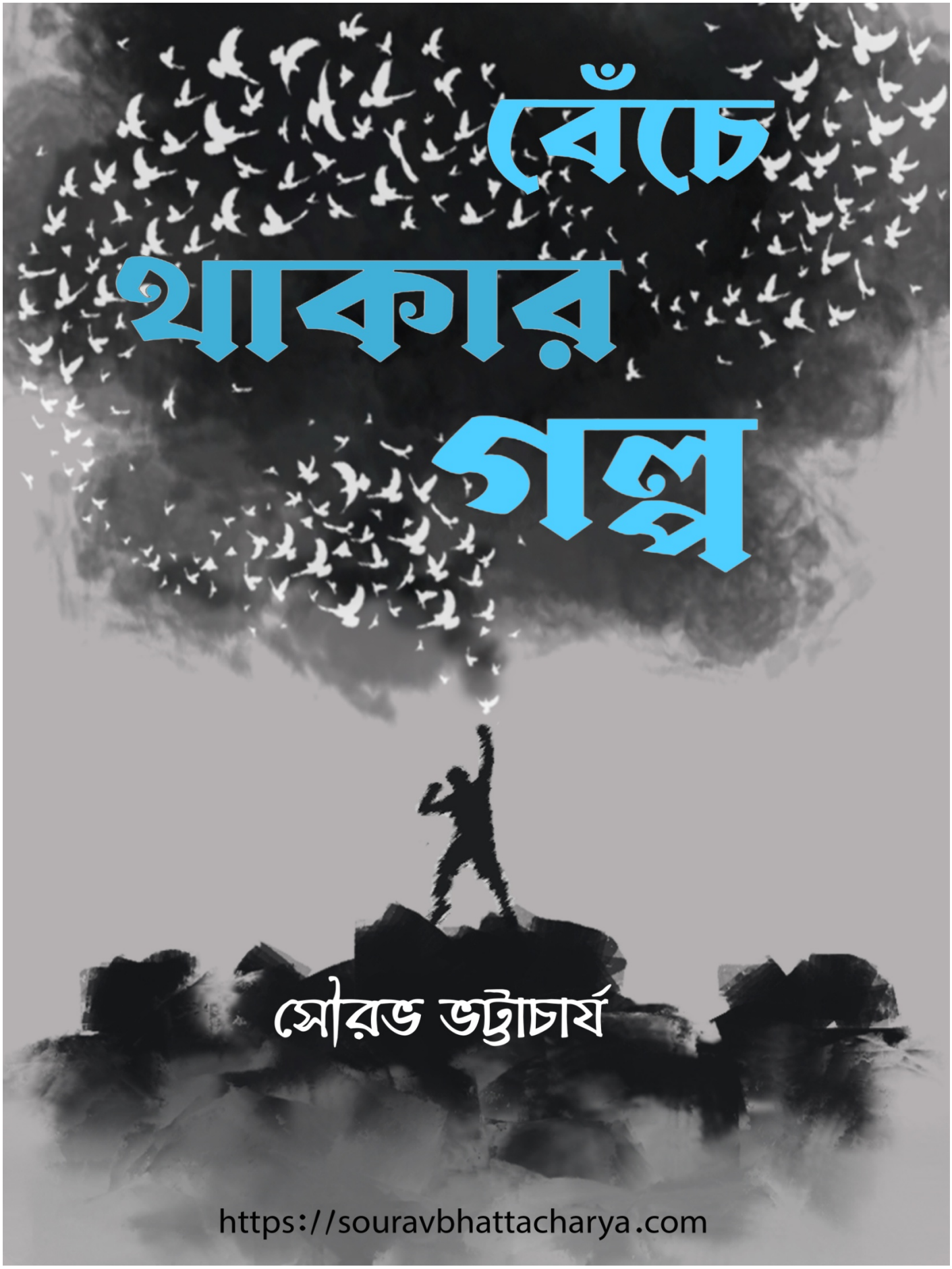
বেঁচে থাকার গল্প
সৌরভ ভট্টাচার্য
https://souravbhattacharya.com

বেঁচে থাকার গল্প

সৌরভ ভট্টাচার্য

Sourav Bhattacharya

Beche Thakar Galpo

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

সৌরভ ভট্টাচার্য

Cover Design: Suman Das

©Sourav Bhattacharya

souravasya@gmail.com

www.souravbhattacharya.com
www.souravasya.blogspot.com

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

Sourav Bhattacharya

সংকলন

সাগর শীল

বিশ্বদীপ কর

অনিকেত ঘোষ

সম্পাদনা

সুমন দাস

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

কত কিছুই তো ঘটে চলে চারদিকে। সে সব ঘটনা। মন সে সবের থেকে বেছে বেছে নিজের ঘরে এনে তাকে রঙচঙ করে দেখে, সে সবই হয় গল্প। ঘটনার থেকে কিছুটা বেশি।

বেঁচে থাকার গল্প আসলে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফেরার গল্প। আশার গল্প। জীবনকে হতাশায় ডুবে না যেতে দেওয়ার গল্প। ঘন অন্ধকারে একমুঠো জোনাকির মত রাখলাম।

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

Sourav Bhattacharya

সূচীপত্র

আমারও মন বলছে - 10

ভলুদাদু আর মলু - 13

চোদ্দশাক - 19

বাঁশি - 24

চাঁদের আলো আর গীতবিতান - 27

পাঁচ টাকার বাতাসা - 29

ইচ্ছা-মুক্তি - 36

এই মুহূর্ত - 39

কোমল প্রাণে - 42

মা-ও তাই বলেন - 46

এগারোটা রুটি - 49

হালখাতা – 53

দশকৌণিক – 56

পাঁজর - 59

62 - ভ্রম রে ভ্রমিত মন

70 - দুজনে

72 - মন বাঁচুক

78 - করবী

84 - একটু রোদ

87 - ভাগ্যিস

92 - সে আসবে আবার বাড়ী চিনে

95 - তাকানো

103 - দশটাকা

105 - দুঃখ থেকে ত্রাণ

107 - কোন অন্তিম স্টেশন হয় না

114 - কে তুমি?

120 - ফিরে তাকালো না

Sourav Bhattacharya

আমারও মন বলছে

দড়িটায় ফাঁসও লাগানো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পেটটায় এমন মোচড় দিল আর গাছে ওঠা হল না। অথচ এই পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে দেখতে হরেনের টুক করে ঝুলে পড়ার কথা ছিল।

শালা ভল্টুর চপ....

একটা ঝোপে গিয়ে বসল। যা হওয়ার হল। সমস্যা বউকে নিয়ে। বাপের বাড়ি গেলে আর ফেরে না। মাসের পর মাস কাটিয়ে দেয়। এদিকে বয়েস তো হয়েছে নাকি.... নাই নাই করে সাড়ে পঞ্চান্ন তো হল.... আজ যেই বলেছে সামনের অমাবস্যাটা কাটিয়ে যাব.... তখনই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে হরেন... এই বৈবাহিক জীবন আর রাখা যাবে না.... সন্ন্যাস নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে নিত.... কিন্তু সে আর এ জন্মে হবে না... আজও পরমার চুড়ির ঝংকার বুকে আকুপাকু ডাক তোলে... কাছে এলে নিজেকে কিশোর মনে হয়.... যাক গে....

হয়ে যাওয়ার পর শরীরটা ছেড়ে দিয়েছে। ক্লান্ত লাগছে। বসন্তের বাতাস। ফুরফুরে। ঘুম আসছে যে!

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

দড়ি ফাঁস হয়ে দুলছে। তাতে কটা জোনাকি বসে। আহা! কি রূপ। আকাশে চাঁদ। ফাঁসের দড়িতে জোনাকি। যে দড়িতে পেট না মোচড় দিলে এতক্ষণ সে অতীত।

মাথায় কে বিলি কাটে?

ওমা, একি! এ সে শাশুড়ি মা। যিনি পা ফসকে উঠানে পড়ে এক্কেবারে বৈকুণ্ঠধামে গিয়ে সেঁধিয়েছিলেন।

মা আপনি....

আহা, উঠছ কেন হরেন.... বলি কি কিত্তি করছিলে গো.... মেয়েটা আমার মাছ ছাড়া থাকতে পারে না.... এত বড় সব্বনাশ করছিলে! কেন গো?

হরেনের অভিমান হল। বলল, আর আমি?আমার মরাটা কিছু নয় না?

বালাই ষাট! মরবে কেন? আমি পায়ের নীচে ওই লগিটা চেপে ধরতাম না। কিন্তু পেটের একি অবস্থা বাবা, এতটুকু চপ সহ্য হচ্ছে না! তোমার বাবা তো এই বয়সে গোটা পাঁঠা খেয়ে নিতো গো... ছি ছি....

সে আপনি যাই বলুন... আমি কেন মরতে যাচ্ছিলাম জিজ্ঞাসা করবেন না একবার?

সে আর জেনে কি করব বলো.... যে দুটো আলুর চপ হজম করতে পারে না... তার বাঁচার যে কোনো অধিকার নেই সেই কথাও আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে!

হরেন থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। খানিক ঝিম মেরে থাকল। তারপর বলল, কি সুন্দর জোনাকি... ফাঁসের দড়িতে.... দেখছেন মা?

শাশুড়ি হাওয়ায় মিশে মাঠে শুয়ে বলল, সত্যিই বাবা.... এতদিন সংসার করলুম এমন জোনাকির বাহার চোখে পড়ল না.... রান্নাঘর আর গোয়াল সামলে জীবন কাটল.... সত্যিই তাই, তুমি ফাঁসটা না পাকালে অমন গোল করে মালা হয়ে বসত ওরা বলো?

Sourav Bhattacharya

হরেনের বুকে-পেটে হঠাৎ তুবড়ির মত সুখের ফোয়ারা খুলে গেল। বলল, মা, কাল থেকে সব গাছে একটা করে ফাঁস লাগাবো, জোনাকিগুলো এমন করে মালা হয়ে বসবে... আপনি আসবেন?

হরেনের শাশুড়ি উদাস হয়ে তাকালো হরেনের চোখের দিকে। বলল, সংসারে এমন অকাজে কেউ একটিবারও ডাকেনি আমায় জানো... ডেকেছে মানেই জেনেছি কাজ আছে.... তুমিও আমার মেয়েটাকে কখনও ডেকেছ.... এমন করে?

হরেনের মাথায় যেন রঙের গামলা উলটে গেল। এদ্দিন রঙ দিয়ে ছবি এঁকেছে খালি। রঙ এলোমেলো করে খেলেনি তো কোনোদিন। রঙকে জিজ্ঞাসাই করেনি সে কি হতে চায়.... সব যেন তার মর্জির দাস.... সবাইকে দাস করার ফিকিরে নিজেই হয়েছে জন্মের দাস....

হরেন বলল, মা... কাল আপনি মেয়েকে ডেকে আনুন... আমি ততক্ষণে সারাদিন আরো কতগুলো ফাঁস বানাই... গাছে গাছে লাগাই... তারপরে একসঙ্গে আমি আর ও জোনাকির মালা দেখব... আপনিও.. দেখবেন... একটু আড়ালে..কেমন?

শাশুড়ি হেসে বলল, আড়ালে থাকতে আপত্তি নেই, সংসারে যে এত কিছু দেখার আছে, না মরলে জানতাম না.... তাই ভাবছি... তুমি বানাও... আমি ওকে ডেকে আনি....

শাশুড়ি মিলিয়ে যাচ্ছিল....

হরেন বলল, মা দাঁড়ান। ভোর অবধি থাকুন। এই ফাঁসের দড়িতে শিশির জমবে। আমার মন বলছে সেই শিশিরে সূর্যের আলো পড়ে মুক্তোর মালা হবে.... এটা পুবদিক তো... আসুন... আমার মন বলছে হবে.... দেখি আমরা...

শাশুড়ি বসে বলল, আমারও মন বলছে....

Sourav Bhattacharya

ভোলুদাদু আর মলু

নীল ফ্রক। পায়ে একটা নীল জুতো। চুলে একটা নীল ফিতে বাঁধা। পার্কে বেঞ্চে বসে। বয়েস নয় বছর, চার মাস, তিনদিন। ফ্রকের গা ছুঁয়ে কাঠের বেঞ্চে শোয়ানো একটা নীল ছাতা।

একজন বয়স্ক মানুষ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তার দিকে। মলু একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার সামনের বড় ফ্ল্যাটটার ঝুলবারান্দায় ঝোলানো নীল শাড়িটার দিকে তাকালো। শাড়িটা মনে হচ্ছে উড়ে যাবে। যদি উড়ে আকাশের দিকে যায়, কোনোভাবে আকাশের গায়ে আটকে যায়, কেউ তো বুঝতেই পারবে না কোনটা আকাশ আর কোনটা শাড়ি?

বুড়ো মানুষটা তার পাশে বসল। মলু তার হাতের দিকে আড়চোখে তাকালো। সাদা হাত, মাঝে মাঝে কালো ছোপ ছোপ, রোগা বলে হাড়গুলো বোঝা যাচ্ছে। একটা গোলাপী জামা আর কালো প্যান্ট পরে বসে। বুড়ো হয়ে গেছে লোকটা। মলু দেখল সে সামনের দিকে তাকিয়ে, তাকে কিছু বলছে না।

হঠাৎ বুড়োটা বলল, আপনি কে?

Sourav Bhattacharya

মলু বলল, আমি অনিন্দিতা ঘোষ।

কোন স্কুলে পড়ো? কোন ক্লাস?

বুড়ো মানুষটা তার দিকে না তাকিয়েই কথা বলে যাচ্ছে...

মলু বলল, স্কুল পড়াশোনা নিয়ে কথা বলতে আমি পছন্দ করি না।

বুড়ো মানুষটা বলল, ওহ্, আচ্ছা, আমি দুঃখিত। আমার নাম সমরেশ হালদার। কলেজে পড়াতাম, বাংলা। এখন আমি অন্ধ।

অন্ধ কথাটা শুনেই মলু লাফিয়ে বেঞ্চ থেকে নেমে বুড়ো মানুষটার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি আমায় একটুও দেখতে পাচ্ছ না?

না দিদিভাই...

দিদিভাই বলবে না... ওই নামে আমার দাদু ডাকত... এখন মারা গেছে। বলো তো আমি কি রঙের জামা পরে আছি...?

বুড়ো মানুষটা জিভ কেটে বলল, ইস্..., আমি আবার একটা ভুল করে ফেললাম..., এই বলে সে মলুর দিকে হাত বাড়ালো। মলু নিজেকে একটু এগিয়ে দিল। বুড়ো মানুষটা তার বাঁ কাঁধে হাত দিয়ে বলল, তুমি তো বেশ লম্বা!

মলু আবার বেঞ্চে এসে বসল। শীতের দুপুর, কিন্তু রোদের তাপও নেই, ঠাণ্ডাও তেমন নেই। অল্প হাওয়া দিচ্ছে।

একজন সাইকেল চালিয়ে হুড়দুড় করে এসে বলল, মলু বাড়ি যাও, মা ডাকছেন...

মলু বলল, না। তার রাগ কি পড়েছে এখনও? পড়েনি তো। মা মোবাইলটা আর কিছুক্ষণ তাকে দিলে মোবাইলটা কি খারাপ হয়ে যেত? যত্তসব!

তোমার মোবাইল আছে?

আছে।

Sourav Bhattacharya

ওতে গেম আছে? দেখি...

বুড়ো মানুষটা একটা বোতাম টেপা মোবাইল মলুর হাতে দিয়ে বলল, এই আছে...

মলু বলল, এ বাবা, এতে তো গেম হয় না...

বুড়ো মানুষটা বলল, আমি অন্ধমানুষ, আমি কি গেম খেলতে পারি?

তা বটে..., মলুর রাগটা হুস্ করে কেন জানি অনেকটা কমে গেল। খিদে পাচ্ছে অল্প অল্প... সে বুড়ো মানুষটাকে বলল, তুমি কার্টুন, সিনেমা কিচ্ছু দেখতে পাও না?

বুড়ো মানুষটা বলল, আগে পেতাম... এখন শুধু গান শুনি।

মলু বলল, ও...

মলু দেখল একটা কালো পিঁপড়ে বেঞ্চের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মলু পিঁপড়েটাকে ধরে বুড়ো মানুষটার জামায় ছেড়ে দিল। এরকম দুষ্টুমি সে হামেশাই করে। দেখি কি হয়...

পিঁপড়েটা জামার হাতা বেয়ে বুড়ো মানুষটার রোগা হাতের চামড়ার উপর দিয়ে হাঁটছে। মলু বুড়ো মানুষটার মুখের দিকে তাকালো... ওর সুড়সুড়ি লাগছে না? ও বাবা! সুড়সুড়ি লাগবে কি? ও তো নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে...

পার্কের মাঠ থেকে কয়েকটা ঘাস তুলে নিয়ে বুড়ো মানুষটার জামার পকেটে আস্তে করে ভরে দিল। কিচ্ছু দেখতে পায় না? কি আশ্চর্য লাগছে মলুর। সে খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকল। সব অন্ধকার না, পাতার চামড়ার উপরে যে আলো পড়ছে সে তো বোঝাই যাচ্ছে।

মলু কি করবে বুঝতে পারছে না। বুড়ো মানুষটার ফোন তার হাতে। কল লগ খুলল। শুধু 'মামণি' বলে কাকে একটা ফোন করে দাদুটা। সে ফোনটা করে কানে দিল... ওপাশ থেকে আওয়াজ এলো...

হ্যাঁ বাবা...

আমি মলু বলছি...

Sourav Bhattacharya

কে মলু?...

আমি বিদ্যাবিনোদ স্কুলে পড়ি, তুমি কে?

তুমি কি আমাদের বাড়ি এসেছ? কি মিষ্টি গলা তোমার...

আমি কেন তোমাদের বাড়ি যাব... আমি পার্কে...

মানে... বাবা পার্কে...! সর্বনাশ...!!! শোনো মলু, আমার বাবা সব ভুলে যান... উনি ভুল করে পার্কে চলে এসেছেন।

তুমি বকছ কেন? ভুল করে কেউ পার্কে আসে বোকা? ইচ্ছা করে আসে... রাগ হলে।

শোনো লক্ষ্মীটি... তোমার বাবার নাম কি?

প্রদীপ মিস্ত্রী...

আমি চিনি না। শোনো না... তুমি একটু বাবাকে পৌঁছে দেবে?

তোমার বাবাকে নীলডাউন করে রাখব?

কেন?

কেন, আমার মিসেরা পড়া ভুলে গেলে নীলডাউন করায় তো...

মলু ফোনটা কেটে দিল। তারপর সুইচ অফ্ করে দিল। বুড়ো মানুষটাকে ধাক্কা মেরে বলল, এই তুমি বাড়ি ভুলে গেছ?

বুড়ো মানুষটা চোখ খুলে বলল, আমি কোথায়? আমি টয়লেটে যাব...

মলু জানে পার্কে টয়লেট কোথায়। সে হাতটা ধরে বলল, এসো...

মলু বলল, দোলনায় চড়বে?

বুড়ো মানুষটা বলল, কই... কই..

Sourav Bhattacharya

মলু হাত ধরে বুড়ো মানুষটাকে দোলনার কাছে এনে, দোলনার কাঠটায় দাদুটার হাতটা ছুঁইয়ে বলল, বসো।

বুড়ো মানুষটা বসল। দু'পাশে লোহার শিকল আঁকড়ে বসল।

মলু দাদুটার পিছনে গিয়ে ধীরে ধীরে দোলনাটা দোলাতে দোলাতে বলল, তুমি বাড়ি ভুলে গেছ?

বুড়ো মানুষটা কিচ্ছু বলল না। মলু আবার সামনে এসে দেখল দাদুটা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। নাহ্, একে তো বাড়ি দিয়েই আসতে হবে...

মলু আবার ফোনটা অন্ করতেই বুড়ো মানুষটার মেয়ের ফোন এল...

তুমি ফোনটা বন্ধ করেছিলে মলু...

তুমি বাড়িটা কোথায় বলো।

তোমার আশেপাশে কেউ নেই? বড় কেউ নেই?

মলু চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কেউ কেউ আছে।

মলু বলল, না

মলু এক হাতে কানে ফোন নিয়ে, আরেক হাতে দাদুকে ধরে হাঁটতে লাগল, দাদুর বাড়ি তাদের গলির দিকেই...

দাদুটা মাঝে মাঝেই ঘুমিয়ে পড়ে কেন?

ওটা একটা অসুখ মলু... সব ভুলে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে।

আমার বাবার আছে...

কি আছে মলু?

Sourav Bhattacharya

মা বলে, আমার বাবা আমাদের ভুলে গেছে... মা তাই আমায় নিয়ে একাই থাকে। কি করে আমায় বড়ো করবে বুঝতেই পারে না। রাতদিন বলে...

হুম... তুমি খুব ভালো মলু...

জনাই আসছে। তাকে রাস্তায় দেখতে পেয়েই সাইকেল থেকে নেমে পড়ে কিছু বলতে গেল... মলু ইশারায় তাকে থামতে বলে পাশে হাঁটতে বলল। জনাই তার পাশের বাড়ি থাকে, তাকে পড়ায়, নিজে কলেজে পড়ে।

জনাই তার কানে কানে বলল, তুমি পোস্টমাষ্টার দাদুকে কোথায় পেলে?

মলু বলল, পোস্টমাষ্টার না, কলেজে পড়ায়...

কার সঙ্গে কথা বলছ মলু?

এই যে এই নাও জনাই দাদা...

আর বাড়ি চিনতে অসুবিধা হল না।

এরপর থেকে মলুর একটা পরিবর্তন হল। সে রাগ হলে আর পার্কে যায় না, ভুলো দাদুর বাড়ি যায়। শুধু রাগ হলে না, এমনি এমনিও যায়, মা-ও যায়। এই তো জন্মদিনে মা নেমন্তন্ন করে খাওয়ালো ভুলো দাদুকে। ভুলো দাদু মলুকে চিনতে পারে, আবার পারে না... মলু'র খালি খালি নতুন নাম দেয় --- চটাই... ভল্লু... মানসী... অতসী...

সব নাম মলু খাতায় টুকে রেখে দিয়েছে। এত নাম কেউ কাউকে দেয় নাকি রোজ রোজ! ভুলে যাবে না! শেষে কি সেও হবে ভুলো মলু?

Sourav Bhattacharya

চোদ্দশাক

ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে নিজের কথাগুলো সব পর পর বলে যাওয়া স্বভাব। মাথাটা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে অনর্গল এক দেড় ঘন্টা কথা বলে, নাক চোখ মুছে উনি ঘরে এসে বসেন। এ রোজকার স্বভাব। যত না আত্মীয়স্বজন মাটির উপর দাঁড়িয়ে, তার চাইতে অনেক বেশি আকাশে। একজন দূর সম্পর্কের ভাগ্নী ছাড়া কেউ নেই আজ সত্যি বলতে।

আজ সকালে ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশে থাকা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ চোখ গেল সামনের ফ্ল্যাটের ঝুলবারান্দায়, এক কিশোর টুনি লাগাচ্ছে। কি নাম? জানেন না। কারোরই নাম জানেন না। ইলেকট্রিসিটি বোর্ড থেকে রিট্যায়ার করার পর থেকে কাউকে চিনতে ইচ্ছা করে না। কারোর নাম জানতে ইচ্ছা করে না।

এই ছেলে... এই ছোঁড়া..এই যে এদিকে.... টুনি লাগাচ্ছ কেন?

কালীপুজো না সামনে... আপনার কথা বলা হয়ে গেছে.... ওই ওদের সঙ্গে?.... ছেলেটা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল।

Sourav Bhattacharya

প্রসন্নবাবু মাথাটা কাত করে নীচে লনে হেঁটে যাওয়া এক ছাতার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সেকি কথা শুনছে? শুনছে না। ছাতাটা নাচতে নাচতে হেঁটে যাচ্ছে।

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, বললাম।

ছেলেটা বলল, আমার মা বলেন, আজ রাতে আমাদের সব পূর্বপুরুষরা আসবেন। চোদ্দগুষ্টি। চোদ্দোশাক খেতে আর চোদ্দো প্রদীপ দেখতে। আপনি দেবেন না প্রদীপ? শাক রেঁধেছেন?

প্রসন্নবাবু বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা রেলিঙের মধ্যে ঢুকিয়ে দাঁড়ালেন। আঙুলে চাপ লাগছে। লজ্জা লাগলে নিজেকে কষ্ট দেওয়া অনেককালের স্বভাব প্রসন্নবাবুর। বললেন, না না, আমাদের কাজের লোক, রান্নার লোক ওসব পারে না। ওরা মুসলমান। ওদের ওসব নেই।

তুমি বললেও দিয়ে দেবে না? আমি আসব? তুমি দেবে চোদ্দো প্রদীপ? আর শাক না হয় মা রেঁধে দেবেন নিয়ে আসব। তোমার আপত্তি নেই তো? বাই দ্য ওয়ে, তুমি কিন্তু হেব্বি ভায়োলিন বাজাও। তুমি টাইটানিকের গানটা বাজাবে আমি ভাবতেও পারি না... আমি আমার বন্ধুদের লাইভ শুনিয়েছি.... যতটা শব্দ আসে ওতেই ওরা ফিদা... ওরাও তোমায় মিট করতে চায়... বেশিজন না.... সুইটি, কুহেলী, প্রশান্ত আর ফরজানা... তুমি কি বলো?

এত কথা শোনা অনেকদিন অভ্যাস নেই। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। প্রসন্নবাবু কোনো কথার উত্তর না দিয়ে ঝুলবারান্দা থেকে ঘরে ঢুকে দরজাটা ধড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে নিজের ঘরে এসে শুলেন।

প্রসন্নবাবু কোনোদিন 'লোকে কি বলবে' এই ভাবনার তোয়াক্কা করেননি। বিয়ে করেছিলেন, ছেলেমেয়ে হয়নি, মেনে নিয়েছেন। স্ত্রী সেপারেশন চেয়েছেন, দিয়েছেন। ভাইরা সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি করতে চেয়েছে, অশান্তি করতে দিয়েছেন, নিজে পৈতৃক সম্পত্তি কিছু না নিয়েই। এই ফ্ল্যাটটা কিনেছেন। বন্ধুর ছেলে অনেক টাকা দিয়ে ডেকরেশান করে দিতে চেয়েছে, করতে দিয়েছেন। ঠকছেন জেনেও করতে দিয়েছেন। মানুষের ঠকানোতে অবাক হন না। মানুষের সঙ্কীর্ণতায় আঘাত পান না। খারাপ লাগে কেউ অকারণে ভালোর অভিনয় করলে। তার সামনে আবার ওসব কেন? এইসবের জন্যেই প্রসন্নবাবু মানুষের কথায় কিছু মনে করেন না। কিন্তু ছেলেটা এত কথা কেন বলছে?

Sourav Bhattacharya

প্রদীপ দেওয়াই যায়, কিন্তু কে ঝক্কি করবে! বাজারেই বা কে যাবে! ধুর! যারা আকাশে আছে তারা তো রোজই তার কথা শুনছে, আজ আবার প্রদীপ জ্বেলে ঘটা করে ডাকার কি আছে?

প্রসন্নবাবুর চোখটা লেগে এসেছিল, কলিংবেলের আওয়াজ শুনে ঝটকা লাগল। সাড়ে এগারোটা। দরজা খুলে দেখেন সেই কিশোর। লাল টি-শার্ট আর সবুজ হাফপ্যান্ট পরে তার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে বাটি, ঢাকনা দেওয়া। মানে চোদ্দোশাক। পিঠে ওটা কি? গিটার? কিন্তু কেন?

ছেলেটা হাসল। বলল, মে আই?

ছেলেটা ঘরে ঢুকতে চায়। কিন্তু কেন?ওরা কি গুষ্টিশুদ্ধ চোর, ঠগবাজ? তার নলি কেটে সব সম্পত্তি হাতিয়ে নেবে? শাকের সঙ্গে কি বিষ না ঘুমের ওষুধ মেশানো?

ছেলেটা সোফায় বসে। টেবিলে বাটিটা ঢাকা। ছেলেটা বলল, আমি তোমায় এম্বারাস করছি.... কনফিজড করছি.... ভাবছ কি মতলব... তাই তো?.... আছে.... আমায় ভায়োলিন শেখাবে?... জাস্ট লিসন টু মি... আমি তোমায় ডিসাপয়েন্ট করব না.... একবার শোনো আমায়... বাই দ্য ওয়ে.... আমি ঋক... ফার্স্ট ইয়ার... অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্স...

মানে তুমি কিশোর নও। মানে যুবক। কিন্তু না, তুমি কিশোর। ছেলেটার চোখদুটো ভীষণ ব্রাইট। গিটারটা খুলে টিউন করছে। প্রসন্নবাবুর সুর শুনলে বুকের ভিতর জঙ্গলে মর্মরধ্বনি ওঠে। ঝর্ণার শব্দে মাথা-বুক ভেসে যায়। পেটের পেশিতে চাপ লাগে।

ছেলেটা বাজাচ্ছে, আগর তুম সাথ হো.... গাইছে.... মিষ্টি গলা.... আবেগ আছে.. মায়া আছে.... প্রসন্নবাবু বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে তাল দিচ্ছেন। অল্প অল্প। মুখের পেশীগুলো শিথিল হচ্ছে। সারা শরীরের পেশী শিথিল হচ্ছে। স্নানের সময় হয়ে যাচ্ছে। আজ চিকেন আর ভাত রেঁধে গেছে আসমান... একার মত ভাত আছে। আজ প্রথম মনে হচ্ছে বাড়িতে দু'জনের মত ভাত থাকা উচিৎ।

বলো, কেমন লাগল ডুড....

Sourav Bhattacharya

বাচাল ছেলে। প্রসন্নবাবু বললেন, আমার স্নানের সময় এখন। তুমি এসো। আমি শাক খাই না। আমার পেট খারাপ হয়। থ্যাংক্স ফর ইউর কাইণ্ডনেস। আমি এতে অভ্যস্ত নই। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড ইয়ং ম্যান....

ছেলেটা অপ্রতিভ হল। গিটারটা গুটিয়ে পিঠে নিল। শাকের বাটিটা নিয়ে মাথাটা নীচু করে বেরিয়ে গেল। আত্মসম্মানে লেগেছে। লাগুক। এই বয়সেই টাফ হয়ে যাওয়া দরকার। খুব দরকার। সবাই খারাপ। এটা বুঝে গেলে এই ওয়ার্থলেস টেণ্ডার মনটা থাকবে না.... বি প্র্যাক্টিকাল ম্যান.... প্রসন্নবাবুর মনে কি একটা আনন্দ হচ্ছে। আনন্দ না উত্তেজনা? দুটোই প্রথমে একরকম লাগে। উত্তেজনাকে আনন্দ থেকে আলাদা করতে শিখতে হয়।

প্রসন্নবাবু খেতে বসেছেন, আবার কলিংবেল বাজল। এখন কে?

একজন মাঝবয়েসী ভদ্রমহিলা। নীল শাড়ি গায়ে, চোখে চশমা, হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। আমি নীলাঞ্জনা। ঋক আমার ছেলে। একটু আগে যে আপনার কাছে এসেছিল। আমার বাবা গত মাসে মারা যান, নরম্যাল ডেথ, করোনা পজিটিভ ছিলেন। আমার শাশুড়ী, আমার শ্বশুরও মারা যান মোটামুটি মাসের এদিক ওদিক করেই। সবাই পজিটিভ ছিলেন। ঋক ভীষণ ডিপ্রেশনে চলে গেছে। আজ আপনাকে দেখে ও তাই....

ভদ্রমহিলা নিজেকে সামলে নিলেন। চোখটা ছলছল করতে করতে দাঁড়িয়ে গেল। যেন নাগরদোলায় কারেন্ট চলে গেল হঠাৎ। সব স্থির। কেউ আকাশে, কেউ মাটিতে।

আমি ঋককে আবার বাটিটা দিয়ে পাঠাচ্ছি। আপনি খাবেন। এটা আপনার দায়িত্ব। শুধু আপনার না, আপনার মত সবার দায়িত্ব, নইলে আমরা মানুষেরা নিজেদের একটা বৃহৎ পরিবার কেন বলি? আর শুনুন, রাতে আমি চোদ্দো প্রদীপ কিনে নিয়ে আসব। আজকের ডিনার আমিই রাঁধব। ওর বন্ধুদের আপনি ভায়োলিন শোনাবেন। আর হ্যাঁ, ওই টাইটানিকের গানটাই শোনাবেন। ওটা আজ শুধু প্রেমের গান হিসাবে বাজবে না... ওটা ওদের হারিয়ে যাওয়া মানুষদের গান, ভালোবাসার আশ্রয় হারানো গান হিসাবে বাজবে... আমি আসি। আপনার মনে হতে পারে সবটা জুলুম, কিন্তু এ জুলুমটুকু না করলে যে সমাজ বলে কিছু থাকবে না যে মেশোমশাই...

Sourav Bhattacharya

হুস্ করে কারেন্ট চলে এলো নাগরদোলায়। চোখ থেকে জল বেরিয়ে এসে গাল গড়িয়ে পড়ল। নীলাঞ্জনা কাঁদছেন। প্রসন্নবাবুর গলায়, এঁটো মুখে-ঠোঁটে কান্না দমে। তিনি বললেন, আমি দাঁড়িয়ে আছি। ওকে পাঠান। ও না এলে আমি যাব। কিন্তু এখন আমার কান্না পাচ্ছে। আপনি চলে যান প্লিজ, আমি আজ অবধি কারোর সামনে কাঁদিনি, আমার লজ্জা লাগবে।

প্রসন্নবাবুর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল স্থির। অধীর অপেক্ষায় সে, এগিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ, কদ্দিন পর!

Sourav Bhattacharya

বাঁশি

tacharya

- বাঁশিটা দেবে?

- নাও

- তুমি বাঁচবে কি নিয়ে?

- সুর

- বাঁশি ছাড়া সুর উঠবে কোথায়? তুমি তো বোবা!

- প্রাণে।

- বাজাবে কিসে? গাইবে কিসে?

- প্রাণে

বাঁশিওয়ালার কাছে বাঁশিটা সত্যিই বিক্রি করে দিল সে। সেই পয়সায় মেয়েটার জন্য নতুন জামা কিনে আনল। সস্তা, ভীষণ সস্তা, কিন্তু নতুন।

পরের দিন সকালে উঠে নদীর ধারে গিয়ে বসল। তার বাঁশি নেই। কণ্ঠ নেই। প্রাণে ঢেউ লাগছে সুরের। কি করে সে? বাঁশি বাজিয়ে ভিক্ষা করেই তো দিন চলত তার।

একটা হোটেলে বাসন মাজার কাজ পেলো। রাতে বাসন মাজা শেষ করে সবাই যখন ঘুমায় সে হোটেলের টেবিলে তাল দেয়। চোখে জল ভরে আসে।

মালিক বলল, তুমি কি গান গাও?

সে মাথা নাড়ল। বলল ইশারায় আমি জন্ম বোবা নই। রোগে বোবা। আগে গাইতাম গান। পরে বাজালাম বাঁশি, যখন গলা গেল। মেয়েটার নতুন জামা কিনতে গেল বাঁশিও। তাই এখন প্রাণে জাগে সুর। হাতে দিই তাল।

মালিক বলল, বেশ। আমি দেখি যদি পাই সস্তায় কোনো বাঁশি।

সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বলল, না না। ও দেবে। দরকার বুঝলে।

ইশারা করল দেওয়ালে। টাঙানো ছবি। ঠাকুরের। হাতে বাঁশি।

একদিন এক বাঁশিওয়ালা এলো দোকানে। ভাত খেল। বাঁশির ঝোলা থেকে বাঁশি বার করে দেওয়ালে হেলান দিয়ে লাগল বাজাতে।

সে এসে বসল সামনে। তাল দিল। সুর উঠল জমে। দোকানের বাইরে লোক গেল দাঁড়িয়ে। মালিকের চোখে জল। কে এ?

বাঁশির সুর থামল। লোকে অনেক টাকা দিয়ে গেল। মালিক সব দিয়ে তাকে বলল, নাও, কিনে নিও নতুন বাঁশি। সে ইশারায় বলল, না। বাঁশিওয়ালাকে বলল, নাও। বাঁশিওয়ালা বলল, তবে তুমি নাও আমার থেকে একটা বাঁশি!

সে নিল না। বলল তিনি যখন বুঝবেন, দেবেন।

লোকটা কাজ করতে করতে বুড়ো হল। মালিকও হল বুড়ো। তার যাওয়ার সময় এলো ঘনিয়ে। মালিক বসল শিয়রে। বলল, হ্যাঁ গো, সে তো দিল না বাঁশি!

সে হাসল। ইশারায় বলল, দিয়েছে, প্রাণে। আমায় করেছেন বাঁশি। তিনি বাজিয়েছেন সুখে দুঃখে। আমি শুধু দিয়ে গেছি তাল। আজ বাঁশি ভাঙার সময় হল। আমি আসি। মনে রেখো তাঁর দেওয়া নেওয়ার হিসাবে ভুল হয় না। আমরাই তাল কেটে ফেলি। সুর যায় এগিয়ে। আমরা যাই পেছিয়ে।

Sourav D...

চাঁদের আলো আর গীতবিতান

ঝুলবারান্দায় বসে বসেই বেলা এগারোটা বেজে গেল। সকাল থেকে খাওয়া বলতে এক কাপ করে চা।

"জলখাবার কি বানাতে বলব?"

ভদ্রলোক উত্তর দেননি। স্ত্রীও আর প্রশ্নটা করেননি। আবীরে, রঙে বাড়ির সামনের রাস্তাটা চেনাই যাচ্ছে না।

সেকেণ্ড ওয়েভ শুরু হল যখন ছেলে চলে এসেছিল সিঙ্গাপুর থেকে। বাবা মায়ের কিছু হলে কে দেখবে?

এখন কে দেখবে?

তিনজনই হাস্পাতালে ভর্তি হয়েছিল। ছেলেটাই ফিরল না।

পাড়ার লোকেরা কেউ আসেনি। সেই ভালো। কেউ কেউ ফোন করেছিল। কথা বলতে ভালো লাগে না।

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

সন্ধ্যে হল। গীতবিতানটা নিয়ে বাবা মা বসলেন ছেলের ছবির সামনে। ভীষণ ভালো গাইত বাবু। দক্ষিণীতে শিখত। কয়েকটা গান গাইবেন। বাবুর জন্য।

গান শুরু হল। বাবা গাইছেন, দীপ নিভে গেছে মম।

পূর্ণিমার চাঁদ ঝুলবারান্দা পেরিয়ে আলোর ডালা সাজিয়ে বসেছে বাবা মাকে ঘিরে। মা নিজের হাতটা চাঁদের আলোয় ধরলেন। চাঁদের আলো বেয়ে যেন বাবু হাতটা ছুঁয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলেন। চাঁদের আলো, প্রদীপের আলো, বাবুর হাসি মুখ, দীঘায় তোলা, আর তারা দু'জন। এই তো সব। এই তো ঘর। গীতবিতানের পাতা মোড়া।

"শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে"। মা গাইছেন। গীতবিতানের কিছু পাতায় চিরকালের বাস। সবার নিজের নিজের পাতা থাকে গীতবিতানে। নিজের নিজের গানের পাতা।

প্রদীপটা অল্প অল্প কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভদ্রলোক বললেন, বাবু যায়নি কোথাও। একটু আবীর নিয়ে এসো। ওর গালে দিই। দু'বছর তো আসতেই পারেনি বেচারা। কি মন খারাপ করত। এ বছর দিই, এসো।

ভদ্রমহিলা আবীর আনতে গেলেন ঠাকুরঘরের দিকে। অন্ধকারেই। কিছু জিনিস খুঁজে পেতে বাইরের আলো লাগে না যে!

Sourav Bhattacharya

পাঁচ টাকার বাতাসা

যতীন তার মেয়েকে নিয়ে রথ দেখাতে এসেছিল। শুনল রথ চলবে না এ বছর। যতীনের চার বছরের মেয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করছে, বাবা রথ কই রে? বাবা রথ কই? বাবা জগন্নাথ কই বাবা?

যতীন এ গ্রামে আসেনি আগে। এ গ্রামে আসতে রেলে চাপতে হয়। টাকা লাগে। তার অতটাকা কই? কিন্তু গেল বছর মেয়েটা যখন ভীষণ অসুখে পড়ল, সে জগন্নাথ দেবের কাছে মানত করেছিল, প্রভু তুমি যদি মেয়েটাকে ফিরিয়ে দাও, তবে তোমার রথের দিন আমি পাঁচটাকার বাতাসা লুট দেব, হরিগ্রামে গিয়েই দেব। হরিগ্রামের রথের কথা দূর দূর অবধি প্রসিদ্ধ।

যতীন দেখে রাস্তায় রাস্তায় জমায়েত। মানুষের মুখগুলো শোকে ভার। কি হয়েছে গো? যতীন মেয়েকে কোলে করে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

একজন বলল, আমাদের বড় মোহান্ত মারা গেছেন। আমরা অনাথ হয়েছি দাদা।

লোকটার বলতে গিয়ে গলা বুজে এলো।

যতীন জিজ্ঞাসা করল, উনিই বুঝি জগন্নাথদেবের পূজারী ছিলেন?

Sourav Bhattacharya

সে বলল, না না। উনি এক অন্য মানুষ ছিলেন।

যতীন বলল, এত মানুষের চোখে জল, কান্না কেন?

সে বলল, মোহান্ত অনেক মানুষের কান্না থামিয়েছিলেন যে... তাই...

যতীনের মেয়ে বলল, রথ চলবে না বাবা?

যতীন কিছু বলার আগেই সে ব্যক্তি বলল, না মা। তোমরা কোত্থেকে এসেছ?

মেয়েটা বলল, আমরা রেলে চেপে এসেছি তো... সেই বৈঁচিগ্রাম থেকে।

সে বলল, সে রাস্তা তো অনেকটা... তারপর যতীনের দিকে তাকিয়ে বলল, খেয়েছেন কিছু?

যতীন হ্যাঁ বা না বলার আগেই মেয়েটা বলল, না তো কাকু... আমার নাম মানসী... তুমি তো আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে না... আমি নিজে থেকেই বললাম... তোমার কাছে গুড় রুটি আছে... বাবা আর আমি খাই...

যতীনের কান মুখ লাল হয়ে গেল। খিদে যে পাইনি তা তো নয়... তাই বলে এইভাবে... ছি ছি.. মেয়েটা আদরে আদরে বড় আস্কারা পেয়ে গেছে...

সে বড় বড় চোখ করে বলল, অমন বলতে হয় মা... আমরা রেল স্টেশানের দোকান থেকে খেয়ে নেব না হয় কিছু... চলো...

মেয়েটা বলল, আমার কি তোমায় বলা অন্যায় হল কাকু? কিন্তু আমার যে সত্যিই খিদে লেগেছে, তুমি পেটে হাতটা দিয়ে দেখো কাকু... পেটটা ঢুকে গেছে...

সে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে কোলে তুলে নিল। বলল, মা, আমার নাম অতীন.. আমি তোমার কাকু হই... আমায় খিদের কথা বলবে না তো কাকে বলবে.. আমার বাড়ি চলো, আমারও তোমার মত একটা মেয়ে আছে... চলো মা...

Sourav Bhattacharya

যতীন হাতজোড় করে বলল, ছি ছি দাদা...ও ছেলেমানুষ... আপনি ওর কথা নেবেন না ওভাবে... খিদে আমাদের বাপ-মেয়েতে পেয়েছে ঠিক... কিন্তু তা বলে আপনার বাড়ি গিয়ে আপনাদের বিব্রত করব.. একি ঠিক... ছি ছি...

অতীন বলল, হাতজোড় করে বলল, দেখুন আজ যদি বড় মোহন্ত থাকতেন তবে আপনাদের নিয়ে আশ্রমেই চলে যেতাম। কিন্তু তিনি নেই বলেই কি তাঁর শিক্ষাদীক্ষাও সব ভাসিয়ে দেব... আসুন অনুগ্রহ করে...

বলতে বলত অতীনের চোখের কোল ভিজে এলো। যতীন বলল, জানি না উনি কে ছিলেন দাদা... তবে যিনি এত মানুষকে এভাবে কাঁদাতে পারেন তিনি যে সামান্য কেউ নন সে বুঝি....

অতীন বলল, দাদা, আজ যদি ধুলোবালি, গাছপালা, পুকুর মাঠঘাটের কথা আমরা শুনতে পেতাম তবে জানতাম ওরাও কাঁদছে... সে সে সোনার মানুষ দাদা... সাধন বলতে ছিল মানুষ... মানুষের মধ্যেই সব বলতেন... বলেন

========

অতীনের ঘরের দরজায় পা দিতেই ভিতর থেকে কান্নার আওয়াজ এলো। কিন্তু আওয়াজটা অন্যরকম। মানসী বলল, কে কাঁদছে গো...

একটা বাচ্চা মাটির দালানে বসে কাঁদছে। তার মা তাকে বুঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিছু একটা।

মানসী তাড়াতাড়ি বাবার কোল থেকে নেমে বাচ্চাটার কাছে গিয়ে বসে বলল, কি হয়েছে বোন? আমায় বল.. কি হয়েছে?

ওর মা বলল, ও কথা বলতে পারে না মা... তুমি কে?

Sourav Bhattacharya

অতীন এতক্ষণে পাশে এসে বসেছে। শুভ্রাকে সবটা বলল। শুভ্রা সবটা শুনে বলল, হা জগন্নাথ.. আজই আমার বাড়ির উনুনে আমি আঁচটুকু দিতে পারিনি...

যতীন লজ্জা পেয়ে বলল, ছি ছি... আপনি বিব্রত হবেন না....

অতীন বাধা দিয়ে বলল, কি হয়েছে...

শুভ্রা বলল, তুমি তো চলে গেলে। তারপর থেকে মেয়ের বায়না রথ দেখতে যাবে। আমি বোঝাতেই পারছি না...

শুভ্রার গলা ধরে এলো।

যতীন বুঝল শোকের কারণ অনেক। সে বলল, আপনি ব্যস্ত হবেন না...

ইতিমধ্যে মানসী সবটা শুনে বলল, আমি তোমাকে রথ দেখাতে নিয়ে যাব বোন.. তুমি খেয়ে নাও... কাকিমা শোনো... তোমার বাড়ি চিঁড়ে দই নেই... আমাদের তাই দাও না গো... বড্ড খিদে লেগেছে... আমরা রথ দেখতে যাব...

অতীন বলল তাই আনো শুভ্রা.... আজ হয় তো গুরুদেবের তাই ইচ্ছা....

যতীন বলল, আপনারা সবাই কি ওনার কাছেই দীক্ষিত?

অতীন বলল, উনি মন্ত্রদীক্ষা দিতেন না... বলতেন ঈশ্বরের নাম স্নেহের সঙ্গে নিলেই হল... ভালোবাসা ছোলার অঙ্কুরের মত.. স্নেহে জন্মায়... বড় হয়...

মানসী বলল, কাকু ওর জন্য নতুন জামা বার করো....

অতীন বলল, কিন্তু রথ তো...

আহা, তুমি আনো না কাকু... রথ চলে কি না চলে আমি দেখছি...

যতীন মেয়েকে চেনে। সে বাধা দিল না।

========

Sourav Bhattacharya

চিঁড়ে-দই খেয়ে সবাই আশ্রমের দিকে এগোলো। রাস্তায় যাকেই দেখে মানসী তাকেই বলে, এসো এসো রথের রশি টানবে... এসো গো এসো।

শুভ্রার কোলে জবা হেসে ওঠে হাততালি দিয়ে। যেন সব শুনতে পাচ্ছে। বলতে চেষ্টা করে রথ.... যেন সত্যিই সে বলতে পারে।

কিছু কিছু মানুষ সত্যিই তাদের সঙ্গে যেতে শুরু করল। যতীন তাদের বলতে চেষ্টা করল, ও ছেলেমানুষ... এ গ্রামে নতুন... আপনারা অনুগ্রহ করে ফিরে যান...

তারা বলল, যাই না... আশ্রমেই তো যাচ্ছি...

তারা মানসীর সঙ্গে গল্প শুরু করল। মানসীও হাজার একটা গল্প শুরু করল। দেখতে দেখতে আশ্রম এসে গেল। বাইরে রথ রাখা। শূন্য রথ।

এত মানুষ এই অসময়ে আশ্রমে দেখে ছোটো মোহান্ত এগিয়ে এসে বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো...

মানসী বলল, আমরা দূর থেকে এসেছি, আচ্ছা না হয় আমার কথা ছাড়ো... এই যে বাচ্চাটা সকাল থেকে কেঁদে যাচ্ছে রথের জন্য সে খবর রাখো?

ছোটো মোহান্ত বড় বড় চোখ করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে মা?

অতীন সবটা খুলে বলল।

ছোটো মোহান্ত বললেন, দেখো মা...

মানসী বলল, তুমি কি বলবে আমি জানি... আমায় আগে বলো জগন্নাথকে সকালের ভোগ দেওয়া হয়েছে?

ছোটো মোহান্ত বলল, হ্যাঁ, দই চিঁড়ে... কেন বলো তো মা?

মানসী বলল, সে যদি রথে না চড়তে চায় তবে সিংহাসন থেকে তাকে নামালো কে?

ছোটো মোহান্ত বলল, কই মা? প্রভু তো সিংহাসনেই বিরাজমান...

Sourav Bhattacharya

মানসী বলল, চলো তো দেখি...

সবাই মন্দিরের দিকে এগোলো।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। ভোগ দেওয়া বলে। দরজা খুলতেই সবাই বিস্মিত। তাই তো, প্রভু যে মাটিতে...

মানসী এগিয়ে গেল। জগন্নাথদেবকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, চলো তো... একদিন মাত্র বেড়াতে নিয়ে যাবে তাতেও কত... এসো... সে এগোতে এগোতে শুভ্রাকে বলল, কাকিমা তুমি বোনের কোলে বলরামকে দাও... আর বাবা তুমি সুভদ্রাকে নিয়ে এসো কোলে করে... আমায় যেমন করে নাও...

শুভ্রা তাকালো ছোটো মোহান্তর দিকে। তিনি বললেন, নাও মা কোলে নাও... আমাকে এ আশ্রমেই থাকতে হবে... এই অবধি আমার হুকুম চলে, ও তো জগতের মালিকের হুকুম নিয়ে এসেছে...না ও নাও... তোমরা প্রস্তুত হও...গ্রামে ঘোষণা করে দাও প্রভু আসছেন...

বড় মোহান্তর সমাধিতে ধূপ, দীপ জ্বালা হল। সে ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে গেল সারা গ্রাম। সারা গ্রাম সেজে উঠল দেখতে দেখতে। শুরু হল নামসঙ্কীর্তন। আকাশ বাতাসে খোলের শব্দ, মৃদঙ্গের শব্দ। উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি উঠল। রথের উপর জগন্নাথকে কোলে নিয়ে বসে মানসী, বলরামকে কোলে করে জবা আর সুভদ্রাকে কোলে নিয়ে বসে যতীন। মানসী বলেছে আমাকে যেমন কোলে করো তেমনই।

কিন্তু কোলে বসে কেন? মানসী বলল, আমার কোল থেকে নামবেই না... চেষ্টা করেই দেখো...

ছোটো মোহান্ত বলল, নামার তো কোনো কারণ দেখি না মা... এ আদর দিতে আমরা ভুলেছি বলেই যে না প্রভু আমাদের নিয়মের জিনিস হয়েছেন। বাচ্চার কান্না অবধি কানে এসে পৌঁছায় না। তুমি ওনাকে কোলেই রাখো, এই আমাদের অনুরোধে। আজ প্রভু জড়রথে চড়বেন না। জীবন রথে চড়বেন বলেই তোমাকে ডেকে এনেছেন। নইলে তোমার ডাকে এমন স্বাভাবিক সাড়া জাগল কেন

Sourav Bhattacharya

সবার প্রাণে? বড় মোহান্ত বলতেন, তিনি যখন ডাক পাঠান তখন সে ডাকে সাড়া না দিয়ে গতি থাকে না মানুষের... তাঁর ডাকই তাঁর পরিচয়... যে ডাকে সাড়া দিয়েই মুক্তি... ক্ষুদ্রতা থেকে।

মানসী সবটা শুনে বলল, বাবা তুমি ওনাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে দাও... আমাদের সেই বাতাসার মানতটা গো... নইলে আবার উনি মন্ত্র পড়ে পড়ে বেড়াতে যাওয়াটাই মাটি করবেন...

ছোটো মোহান্তর সঙ্গে সবাই হেসে উঠল। সঙ্কীর্তনের আনন্দে মিশে গেল খোলা প্রাণের আনন্দ, খোলের শব্দে মাতোয়ারা হয়ে।

Sourav Bhattacharya

ইচ্ছা-মুক্তি

সিদ্ধেশ্বরবাবু ওরফে সিধাইবাবু যখন জানলেন তার ইচ্ছার কোনো ধার জগদম্বা ধারেন না, তখন থেকে তিনি নিজের ইচ্ছা আর জগদম্বার ইচ্ছা দুটোকেই পাত্তা দেওয়া ছেড়ে দিলেন। মনটা সারাদিন ফুরফুরে থাকে। নিজের মনে কোনো ইচ্ছা হলেই বলে, ভাগ শালা, শুনবই না। আর চলতে ফিরতে কোনো মন্দির পড়লে বলে, যা খুশী করো গে.. আমার তাতে কি?

একবার ফুচকা খেতে গেলেন। তেঁতুলগোলা জলে যে আরশোলা ছিল কে জানবে? যেই না হাতে ফুচকা দিয়েছে, অমনি মড়া আরশোলা ফুচকার গর্তে চিৎ হয়ে ভেসে উঠেছে।

এখন এই ফুচকায় আরশোলা ভাসানোর ইচ্ছা তো তার না। কার? যার ইচ্ছা আরশোলা নিয়ে তাঁর মন্দিরে গেলেন। মায়ের সামনে আরশোলা রেখে বললেন, এতেই জব্দ করবি ভেবেছিস? শুনবই না তোর ইচ্ছা। এই নে তোর ইচ্ছা তোর কাছেই রেখে গেলাম।

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

একবার ছাদে ঘুড়ি পাড়তে গিয়ে পা ভাঙলেন। হাস্পাতালে শুয়ে থাকলেন একমাস। যে-ই আসে দেখা করতে তাকেই বলেন, এ আমার ইচ্ছা না রে বাবা, আমি তো ঘুড়িটা পেড়ে একটু ওড়াবো ভেবেছিলাম। তা না...

যা হোক। হাস্পাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার মন্দিরে এলেন। বললেন, কি চেয়েছিলি খুলে বল তো... হাঁটব না? শুয়ে শুয়ে বাড়িশুদ্ধ লোকের গালাগাল খেয়ে বেঁচে থাকব? যত্তসব!

সমস্যাটা হল মেয়ের বিয়ে নিয়ে। যতই খুঁজুন, পাওয়া আর যায় না। শেষে একদিন সবাই বলল, মায়ের ইচ্ছা যখন তখনই হবে।

তিনি মায়ের মন্দিরে গেলেন। মাকে বললেন, তাই নাকি? সবাই যা বলছে, তাই সত্যি?

আবার খোঁজা শুরু হল। এবারে পাওয়া গেল। সবাই বলল, মা চাইলেন তাই হল।

ধুমধাম করে বিয়ে হল। বিয়ের আগের দিন রাতে মন্দিরে গেলেন, বললেন, আসিস পারলে। ক'টা মিষ্টি ঠাকুরঘরে রেখে দেব।

বিয়ে হল। সবই ঠিক চলছিল। কিন্তু মেয়েটা বিধবা হল সাড়ে চার বছরের মাথায়। ফিরে এলো বাবার কাছে। বাবা কিছু বললেন না। চুপ।

একদিন সন্ধ্যেবেলা মেয়েকে নিয়ে বসলেন মন্দিরের বারান্দায়।

মেয়ে বলল, কেন হল বাবা?

উনি হাসলেন। বললেন, আমার ইচ্ছায় তো কিছু হয় না রে মা। না তো তোর ইচ্ছায়। যা হয় ওই উনি...

মেয়েটার চোখের কোল জলে ভরে এলো। অভিমানের সুরে বললেন, তাও কেন এলাম আমরা?

সিদ্ধেশ্বরবাবুর চোখের পাতা ভিজে এলো। বললেন, আমাদের উপর জোর তো করেন না... তুই চাইলে ওনাকে অস্বীকার করেও তো থাকতে পারিস... আমি যেমন থাকি.... যে নিজেকে চাপায়

Sourav Bhattacharya

না... তার কাছেই তো নিরাপদ রে.... সুখদুঃখ তো থাকবেই... ধ্রুবতারার থেকে চোখটা না সরলেই হল,.. ডুবতে ভয় নেই... তবু তল পাব... হারালে তল আর জল দুই-ই যাবে যে।

Sourav Bhattacharya

এই মুহূর্ত

Bhattacharya

গুরু বললেন, তুমি যখন বাড়ি থাকবে তোমাকে তখন গিয়ে দীক্ষা দিয়ে আসব।

শিষ্য আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, তবে তো ভীষণ ভালো হবে গুরুদেব। আমার বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে।

গুরু হাসলেন। বললেন, কাল সকালে আসব।

পরেরদিন বিকেলে শিষ্য গেল আশ্রমে। গুরুদেব, আপনি এলেন না? আমি সারাটা সকাল অপেক্ষা করে বসেছিলাম। দোকান খুললাম না আজ।

গুরু বললেন, গিয়েছিলাম তো। তুমি দোকানে ছিলে। শরীর বাড়িতেই ছিল। আমি শরীরকে দীক্ষিত করি না। মনকে করি।

শিষ্য লজ্জা পেল। বলল, আর হবে না। আপনি আসুন। কাল সকালে?

গুরু বললেন, না, দুপুরে। তিনটের পর। ক্ষুধার্ত থেকো না। খেয়ে নিও। আমি আসব।

শিষ্য সন্ধ্যেবেলা গেল পরেরদিন আবার। গুরু আসেননি।

গুরু বললেন, গিয়েছিলাম। তুমি কয়েক বছর পিছিয়ে ছিলে। তোমার বাড়ির সামনের জমিটা তুমি তোমার দুর্দিনে বিক্রি করেছিলে। সেখানে চারতলা বাজার বসছে। তুমি সেই কেনাবেচার দিন দরদাম খতিয়ে দেখছিলে আবার, ঠকে গেছ কিনা।

শিষ্য সাশ্রুনয়নে বলল, ঠকেছি?

গুরু বললেন, রোজ ঠকছ, ঠকাচ্ছ।

শিষ্য বলল, কাল আসুন.. আমার স্বভাব নষ্ট.. আমায় ত্যাগ করবেন না....

গুরু বললেন, সন্ধ্যেবেলা।

শিষ্য অনেক রাতে গিয়ে পৌঁছাল আশ্রমে। গুরুদেব আসেননি।

গুরুদেব বললেন, গিয়েছিলাম। তুমি ব্যস্ত ছিলে আমায় নিয়ে। দীক্ষার পর তুমি যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হবে তখন কি কি করবে সেই নিয়ে আমার সঙ্গে শলাপরামর্শ করছিলে। তোমার মান হবে। টাকা হবে। তোমার নামে মন্দির হবে তুমি মারা গেলে। আমার আশ্রম সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে তোমার ব্যবসায় লাভ হলে। এইসব আর কি। আমি ফিরে এলাম।

শিষ্য ফিরে এল।

বছর যায়। শিষ্য মনকে দেখে। তার গতিবিধি দেখে। আশ্চর্য হয়। অবাক হয়। নিজের দুঃখের কারণ সে নিজে। নিজের সুখের কারণও সে। বাসনা তাকে নাকে দড়ি দিয়ে রাতদিন ঘোরায়। এক দণ্ড শান্তি নেই তার। সে বাঁচল কখন? সে তো শুধু মনের দাসত্ব করেই কাটালো! চোখে জল এলো। সামনে সব কিছু হঠাৎ কি স্পষ্ট, স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। আলোয় আলো হয়ে যাচ্ছে।

সে স্থির তাকিয়ে আছে। ক্রমশ সব হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু আলো আর আলো। সেই আলোর মধ্যে কে যেন এসে দাঁড়ালো। গুরুদেব!

সে বলল, আমায় মন্ত্র দিন!

গুরুদেব বললেন, এই তো মন্ত্র.. এই মনের যে দ্রষ্টা... তোর আমি-র যে স্রষ্টা... সেই এই এই এই... এই মুহূর্তেই... এই মন্ত্র... "এই মুহূর্ত.. সেই মুহূর্ত"।

Sourav Bhattacharya

কোমল প্রাণে

ডাবগুলো সব বিক্রি হল। গ্রামে ফিরছে ফাগু। সোজা রাস্তা। খুব গরম। রাস্তার ধারে একটা শিবের মন্দির। ফাগু দাঁড়ালো। পকেট থেকে একটা পাঁচটাকার কয়েন বার করে মন্দিরের বারান্দায় রাখল। ফাগু শেখের বিক্রিবাট্টা ভালো হলে কিছু টাকা দেয়। ধর্ম দেখে না। জানে সবই এক। আব্বু একতারা বানাতে পারত খুব ভালো। খোলও বানাতো দারুণ। দূর দূর থেকে মানুষ আসত। তখন ফাগু কত ছোটো। ফাগু মানুষে বিশ্বাস করে। মসজিদ, মন্দির যাই পড়ে, ফাগু সামর্থ্যে কুলালে কোনো একটা জায়গায় একটা কয়েন রেখে দেয়। মানুষের জন্য। আল্লাহ যাকে দেখাবেন সে দেখবে। নেবে। এ গভীর বিশ্বাস ফাগুর। টাকা তো মানুষেরই দরকার। মালিকের কি দরকার? ফাগুর আব্বু লালনের গান গাইত। অল্প অল্প সুর করে সেও গাইত। ফাগু একা থাকলেই আব্বুর গলার আওয়াজ শুনতে পায়। এখন যেমন পাচ্ছে। আব্বু কানের কাছে এসে বলছে একটা গান শোনা তো ফাগু... ফাগু শিব মন্দিরের চাতালে বসে। গুনগুন করছে। দূর দূর কোনো মানুষ নেই। এত গরম যে পাখিও উড়ছে না আকাশে।

একবার এই মন্দিরের ধারেই এক মরণাপন্ন বুড়ো ভিখারিকে জল দিয়েছিল মুখে। সে ছিল বৈষ্ণব। তার কোলেই মাথা রেখে মারা গিয়েছিল সে। ফাগু তাকিয়ে দেখেছিল, মানুষ মারা গেলে সবাইকে সমান দেখায়। পশু, মানুষ মারা গেলে জড় পদার্থ হয়ে যায়। জড় পদার্থের সঙ্গে জড়

Sourav Bhattacharya

পদার্থের ঠোকাঠুকি লাগে না নিজে থেকে। মৃত মানুষের কোনো ধর্ম হয় না। মানুষ জ্যান্ত থাকলেই আকাম করে। জ্যান্ত থাকে, জেগে থাকে না। আব্বু বলত, ফাগু সজাগ থাক। জাগায় থাক। নইলে চোরে সিঁধ দেবে। জানতি পারবিনানে।

কে যে চোর, বলেনি আব্বু। কিন্তু ফাগু যেন অল্প অল্প বুঝছে। জাগায় থাকা মানে বুঝছে এই চল্লিশ পেরিয়ে পঞ্চাশের দোরগোড়ায় এসে। ফাগু জাগায় থাকে। জাগায় থাকা মানে সুরে থাকা। ফাগু একা থাকলে গান গায়। লালনের গানই গায় বেশি। লালনের গানে বুকের দরজায় হাওয়া লাগে। পাল্লা খুলে যায়। ভিতরের মানুষ বাইরে বেরিয়ে আসে। হাওয়া খায়। আকাশ দেখে। পাখি দেখে। সবুজ ঘাস দেখে। মানুষের চোখে চোখ রেখে মানুষ খোঁজে। ভিতরের মানুষ সবার ভিতর এক। সে দরদী। দরদীকে সরিয়ে দিলে ভিতরে যে থাকে সে শয়তান। তার চালচলন ভালো লাগে না ফাগুর। অনেক মানুষের চোখেমুখে তাকে দেখেছে। সে অনিষ্ট করে। মানুষই মানুষের অনিষ্ট করে। দরদী হলে করে না।

ফাগু উঠতে যাবে, এমন সময় একটা বাচ্চা ছেলে এলো। কাঁধে ব্যাগ। বলল, এখানে খাবার জল আছে গো কোথাও?

ফাগু বলল, মন্দিরের পিছনে যা, একটা কল আছে।

ফাগু সঙ্গে গেল। কল টিপে দেবে। এত বাচ্চা, ও তো হাতেই পাবে না।

ছেলেটা চোখেমুখে জল দিল। বারো তেরো বছর হবে। রোগা, রোদে পোড়া মুখ। সকাল থেকে কিছু পেটে কিছু জুটেছে বলেও তো মনে হল না।

সে অনেকটা জল খেলো। তারপর মন্দিরের বারান্দায় এসে বসল। ছেলেটা বলল, আমি এই গ্রামে আগে আসিনি, আমার মাসির বাড়ি এখানে, মা বলল একবার ঘুরে আয়, মাসির নাকি জ্বর হয়েছিল শুনেছে মা কার কাছ থেকে... আমি এই লোকাল ট্রেনে লেবু লজেন্স বিক্রি করি... এ মা! এখানে কার টাকা রাখা.. পাঁচ টাকা.. দেখো...

ফাগু দেখল। বলল, কে ফেলে গেছে। তুই নিতে পারিস।

ছেলেটা জিভ কেটে বলল, হুস.. কার না কার টাকা... তুমি কি এই গ্রামেই থাকো?...

Sourav Bhattacharya

ফাগু মাথা নাড়ল। বলল, সকাল থেকে খেয়েছিস কিছু?

ছেলেটা মাথা নেড়ে হাসল। ফাগুর কষ্ট হল। তার মেয়েটার মত বয়েস। ফাগু বলল, বাবা নেই না? নাম কি তোর?

ছেলেটা বলল, আমার নাম জগন্নাথ সামন্ত। বাবা নেই গো। আমি ছোটো থাকতেই মারা গেছে। আমি, মা আর পিসি থাকি।

ফাগু বলল, তোর মাসির নাম কি?

ফাগু নামটা শুনে দমে গেল। কাল রাতেই মারা গেছে সে। টাইফয়েড হয়েছিল। ফাগু বলল, জগন্নাথ, তুই কি আমাদের বাড়ি হয়ে মাসির বাড়ি যাবি? একসঙ্গে খেয়ে তোকে তোর মাসির বাড়ি দিয়ে আসবখন। যাবি? তবে আমি কিন্তু মুসলমান...

জগন্নাথ লজ্জা পেল। বলল, এত বেলা হল, তোমার বাড়ি রান্না হয়ে গেছে না? তুমিও তো আর বড়লোক নও... আমি খেলে তোমার খাওয়ায় কম হবে... আমি বরং মাসির বাড়ি গিয়ে খেয়ে নেব..... মা বলে মাসির রান্নার হাত নাকি দারুণ... জ্বর হয়েছিল.. অ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই সেরে গেছে...

ফাগু বলল, বুঝেছি... আমি মুসলমান বলে...

জগন্নাথ তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আরে তা না গো... খিদের আবার হিন্দু মুসলমান হয় নাকি? এই যে চাল কিনি আমরা বাজার থেকে, সে চাল হিন্দু না মুসলমান চাষ করেছে জানি? ওসব ছোটো কথা..... বোকা লোকদের কথা... আমরা গরীব, আমাদের এটাই জাত... এসব মা বলে, আমি শুনি... আমার পিসির মাথা ফেটে গেছিল.. রক্ত লেগেছিল দু বোতল... এবি পজিটিভ... তখন এক ডাক্তার মাকে বলেছিল.. দেখো গো রক্তের গ্রুপ হয়, জাতধর্ম হয় না... আসলে আমার মা আগে একটু এসব মানত তো... পিসি মরে যাবে দেখে তো সে নিজেই মরে যাচ্ছিল, পিসি মায়ের প্রাণ আমার... তো পিসি বাঁচল.. মা-ও ওসব বলা ছাড়ল... এখন অন্য কথা বলে...

ফাগু উঠে জগন্নাথের হাত ধরে বলল, তবে চল আজ আমার বাড়িই খাবি... না হয় আধপেটাই খাব বাবা ছেলেতে... তোর একটা বোনও আছে... দেখবি... সে আবার কথা বলতে পারে না... কানেও শোনে না....

Sourav Bhattacharya

জগন্নাথের চোখে জল এলো। ফাগুর হাতটা ছাড়ালো না। বলল, চলো।

ফাগু আর জগন্নাথ রোদের মধ্যে হাঁটা লাগালো। ফাগু শক্ত করে ধরে আছে জগন্নাথের ছোটো কোমল হাতটা। এত কোমল হাত, কি করে এই কঠিন সংসারে একা এসে পড়ে... কেন হাত ছেড়ে যায় আব্বু?

আব্বু হাসল। ফাগু শুনল। আব্বু বলল, হাত কঠিন হবে, প্রাণ কোমল থাকুক ফাগু। কোমল প্রাণই মালিকের গলা চেনে... কঠিন প্রাণ কালা হয়.... যেমন তার মেয়ে শোনে... মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবে... চোখের কোল নরম জলে ভরে যায়... ফাগু দেখেছে... বুকের ভিতরে একটা নদী আছে... সে নদীর উৎস জানে না কেউ... মেয়েটা সে নদীর খোঁজ পেয়েছে... ফাগু জানে.. আব্বু বলেছে..

ফাগুর চোখ ঝাপসা হল।

মন্দিরের বারান্দায় রাখা কঠিন ধাতুতে গড়া পয়সায় জগন্নাথ আর ফাগুর ঘাম লেগে। বাতাস এসে ঘামের গন্ধ মিলিয়ে দিল ধীরে ধীরে। পয়সা অপেক্ষা করল অচেনা কারোর, যে অজানা নয়। যাকে আল্লাহ রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে আসবে এখানে। ফাগুর ভালোবাসার কাছে। ভালোবাসার রাস্তা আল্লাহ ছাড়া আর কে দেখাবে? আব্বু বলে লালনের সুরে। ফাগু মজে।

Sourav Bhattacharya

মা-ও তাই বলেন

ধ্যানে যখন বসে তখন সব কেমন সুন্দর, সবের মধ্যে কি সুন্দর শান্তি, সামঞ্জস্য।

ধ্যান থেকে উঠে, নিত্যকর্ম সেরে মন্দির বন্ধ করে সাইকেলটা নিয়ে যখন রাস্তায় নামে পরমানন্দ, মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। সমাজ আর তার ধ্যানের জগতে কিছুতেই বনিবনা হয় না। সমাজে এত অসামঞ্জস্য, এত অবিচার, এত দুঃখ, এত পাপ, এত নিষ্ঠুরতা। এর কোনো সমাধান খুঁজে পায় না সে। গুরু বলেন, ও মায়া, ও লীলা। পরমানন্দের মন সাড়া দেয় না। ধ্যানের সুন্দর, সমাজে বিরসবদনে তাকিয়ে থাকে। ধ্যানেতে প্রসন্ন দৃষ্টি যার, সেই তিনি সমাজে ক্ষুধার্ত, অসহায় দৃষ্টিতে উদাস তাকিয়ে। মিল কোথায়? পরমানন্দ দেখে অনেকেই সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে কোনো না কোনোভাবে নিজেকে নিয়ে মেতে আছে। এই কি ধর্ম? তবে কি স্বার্থপরতাই ধর্ম? সে যত উচ্চতত্ত্বেই তাকে সমর্থন করি না কেন?

মন মানে না। পরমানন্দ ঠিক করল, সে ঈশ্বর আর ধর্মকে ত্যাগ করবে। যাবে না মন্দিরে আর। ছোটো-ছোটো অনাথ বাচ্চাগুলোকে পড়াবে।

Sourav Bhattacharya

যেমন ভাবা তেমন কাজ। পরমানন্দ মন্দিরের কাজে ইস্তফা দিল। বাড়ির সামনে নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে স্কুল চালু করল। গরীব বাচ্চারাই তার ছাত্র। সমাজকে উপেক্ষা করতে যে শেখায় সে বানানো ঈশ্বর হতে পারে, বানানো ধর্ম হতে পারে। তবে সে সত্য না।

একদিন স্কুল শেষ করে পরমানন্দ দীঘির ধারে এসে দাঁড়ালো। স্নান করবে। দেখে কিছুটা দূরে বসে তার এক ছাত্র। মাথা নীচু করে কিছু একটা করছে।

পরমানন্দ কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তাকে খেয়াল করেনি সে। সে ছবি আঁকছে। দীঘির মধ্যে একটা বড় বাড়ি। সামনে রাস্তা। দীঘিতে হাঁস চরে বেড়াচ্ছে।

পরমানন্দ বলল, এ কিসের ছবি?

সে চমকে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বলল, আমার বাড়ির ছবি।

পরমানন্দ হাতের থেকে খাতাটা নিয়ে তাকালো। কোথায় দীঘি, কোথায় হাঁস, কোথায় রাস্তা? এতো সেই মন্দির, তার নিজের হাতে সাজানো দেবতা!

ছেলেটা বলছে, আমি এই ছবি আঁকি। আমার মনটা ভালো হয়ে যায়। আমার তখন কারোর উপর রাগ হয় না, হিংসা হয় না।

পরমানন্দ জিজ্ঞাসা করল, কে শেখালো তোমায় এসব?

মা। আমার মা বলেছেন যে, যাই হোক, নিজের মনকে ছোটো করতে নেই। ছবি আঁকতে হয়। কাগজ পেন্সিল না থাকলে মনে মনেই ছবি আঁকতে হয়। সুন্দর ছবি। ছবি আঁকলে মন থেকে সব হিংসা চলে যায়। রাগ চলে যায়। আবার লড়াই করার শক্তি আসে। মা কি ভুল বলেছে স্যার?

পরমানন্দের মুখ থেকে কথা সরল না। সে বলল, তিনিই ঠিক বলেছেন। তুই আঁক, আমি যাই।

পরমানন্দ দীঘির ধারে বসল। ধ্যানের দরজা খুলে ঢুকল গভীরে। সব ক্ষোভ, সব জ্বালা জুড়িয়ে যাচ্ছে। অন্তরে আনন্দের ছবিকে না পেলে বাইরে তাকে বানায় কি করে মানুষ? খুঁজে পায় কি করে?

Sourav Bhattacharya

সমাজের নতুন ব্যাখ্যা পেলো পরমানন্দ। অন্তরের আবর্জনাকে সমাজে উগরে উগরে সমাজের এই অবস্থা করেছে মানুষ নিজে। অন্তরে শান্তি আর আনন্দের স্রোতকে খুঁজে তাকে বাইরে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে যে সে-ই পেয়েছে সামঞ্জস্যের পথ। মানুষের সমাজ তো পশুর সমাজ নয় যে সে শুধু শরীরের প্রয়োজন ফুরিয়েই শেষ হবে, মানুষের সমাজের একটা বড় ভাগ তো তার মন। তার অন্তঃকরণ। নিজে অশুদ্ধ, স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণ হয়ে সমাজের কোন কল্যাণে লাগে মানুষ?

পরমানন্দ স্নান করল। সারারাত ঘুম এলো না আনন্দে। পরেরদিন স্কুলে এসে বলল, আজ থেকে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে আমরা ছবি আঁকব, গান গাইব, কবিতা বলব। না হয় আধপেটা খেয়েই করব। পেট আর মন দুই নিয়ে মানুষ। দু'জনকেই সুস্থ সবল রাখতে হবে, তাই তো?

তার আগের দিনের দীঘির পাশে বসা ছাত্র মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ স্যার.. মা-ও তাই বলেন।

Sourav Bhattacharya

এগারোটা রুটি

ttacharya

"আজ রুটি করতে ইচ্ছা করছে না... তরকারি সকালের যা আছে হয়ে যাবে... বাজার থেকে একটু রুটিটা নিয়ে চলে আসবে?....."

দুটো ঘর। চার-পা বেশি হাঁটলেই দেওয়াল। বারান্দা মানে সরু গলি। খোলা হাওয়া বলতে বড় রাস্তায় খেলে বেড়ানো হাওয়া সরু গলিতে ঢোকে যেটুকু, সেটুকুই। কালো-নীল ছাপ ছাপ একটা নাইটি আর লালে কালো ফুল আঁকা একটা নাইটি - এই দুটোতেই নিজেকে দেখতে দেখতে চোখে অন্য রঙ যেন আর সহ্য হয় না রাখির।

সাইকেলটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে রেখে সেটাকে চেন-তালা দিয়ে জানলার সাথে বাঁধতে যাচ্ছিল জিতু, রুটির কথাটা শুনে সাইকেল ঘোরালো। মনে মনে হিসাব করল চারটে আর তিনটে সাতটা আর দুটো দুটো মানে এগারোটা। দশটাই নিয়ে আসা যাক। তিরিশ টাকা। পকেটে রাখা মানিব্যাগের দুটো গর্ত মনে করল --- চারটে দশ, একটা পঞ্চাশ, আর একটা একশো। একশোটা একটু ছেঁড়া, ওটাই চালাতে হবে।

বেঁচে থাকার গল্প

রাখির শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। গন্ধ পাচ্ছে না। স্বাদ নেই। পায়খানা হচ্ছে বারবার। জানে করোনা। কিন্তু টেস্ট করাতে যেতে চাইছে না। জিতুরও হয়েছিল কয়েক সপ্তাহ আগে। এখন শুধু দুর্বলতাটা আছে। না তা না, শ্বাসকষ্টটাও হয়। একটু জোরে সাইকেল চালালে বুকটা চাপ হয়ে যায়। যেন আর বাতাস ঢুকবে না। বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। যখন তখন মাথাটা চক্কর দেয়। কিন্তু টেস্ট করালে বিপদ। মিউনিসিপালিটি থেকে এসে কাগজ আটকে দিয়ে যাচ্ছে কাঁচরাপাড়ায় - করোনা পজিটিভ। রাখির কাজটা যাবে। খাবে কি? জিতু বড়বাজারে সোনার দোকানে কাজ করত। কত মাস হল বসা! ট্রেন নেই। যাবে কি করে?এখন এটা ওটা করে কাজ চালায়। হয় না। ওতে কি চলে?কিচ্ছু না। দুটো যমজ বাচ্চা। ছ'বছরে পড়ল। অনলাইন ক্লাস করাচ্ছেন দিদিমণি। কিন্তু নেট ভরার টাকা কই? সে নিয়ে ভাবে না জিতু। কিন্তু রাখিটার চোখ-মুখ বসে যাচ্ছে, কি হবে কে জানে।

রুটির দোকানে ভিড়। মাস্ক পরে নেই কেউ। প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি জিতু। শুধু জ্বর এলো। আর পায়খানা। পিঠটা অসহ্য ব্যথা। ভাবল, কয়েকদিন ঘোষেদের গোলায় বালির লরি খালাস করার কাজ করছিল তাই হবে হয় তো। কিন্তু এত দুর্বলতা? মাথাটা টাল খাচ্ছে। হেঁটে মোড়ের দোকান অবধি যাওয়া যাচ্ছে না। এত জ্বর তো নেই! ডাক্তারের কাছে গেল না। ভয়ে। পাছে টেস্ট করতে পাঠায়। মনে যা ভয় ছিল তাই হল। তিনদিন পর নাকে গন্ধ নেই। রাখিকে বলল না। ভয় পাবে। ইচ্ছা করে একটু দূরে দূরে থাকতে লাগল। কিন্তু এত ছোটো ঘরে কতটা দূরে থাকা যায়। রাতে বাথরুম করতে উঠলে চোখটা টিউবলাইটের মত দবদব করে। বমি পায়। জিভ শুকিয়ে যায়। একটু পরিশ্রম হলেই দরদরিয়ে ঘাম, এমনকি কথা বলতে গেলেও। মারা যাবে? মাঝরাতে উঠে ঘুমন্ত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে চলে গেলে কি হবে? রাখি চারটে বাড়ি কাজ করে, পাঁচ হাজার পায়। চলে না, চালিয়েই নিতে হয়।

"ক'টা দেব জিতু?"

জিতু অন্যমনস্কভাবেই বলল, এগারোটা...

দাম দেওয়ার সময় মনে পড়ল তার একটা রুটি কম খাওয়ার কথা ছিল। তেত্রিশ টাকা।

বাড়ি ফিরে দেখল রাখি শুয়ে আছে বিছানায়। ঘুমিয়ে পড়েছে। জিতু স্নান করতে ঢুকল। ছেলে দুটো পাশের বাড়ি টিভি দেখতে গেছে। যাক। নইলে সন্দেহ করবে। কোনো অন্যায় করছে না তারা। তাদেরও সব আছে। কিন্তু তাদের কেবলের টাকা দেওয়া হয়নি। বন্ধ টিভির স্ক্রিণে রাখির ঘুমন্ত শরীর, ক্লান্ত।

জিতু স্নান করে বেরিয়েও দেখল রাখি ঘুমিয়ে। বুকটা ছ্যাঁৎ করল। নাকের কাছে হাত আনল। না, বেঁচে।

জিতু রাখির পাশে শুলো। রোগটা কে এনেছে বাইরে থেকে? সে, না রাখি? জিতু রাখিকে জড়িয়ে শুলো। খুব ইচ্ছা করে গোটা পরিবার তারা দম আটকে মরে যাক। পৃথিবীটা আর আগের মত হবে না। কোনোদিন হবে না। ছেলেগুলো ভিক্ষা করবে? পড়াশোনা শেখাবে না?কি করে হবে সব?

রাখি চোখ খুলে তাকালো। তাকে দেখেই ধড়ফড় করে উঠে বসল।

কখন এলে?

ভিজে চুলে হাতের আঙুল ঢুকিয়ে বলল, স্নানও হয়ে গেছে?

হুম...। জিতু চোখ বন্ধ করে শুয়ে। রাখি কি মরে যাবে? এই সময়ে ভালো খেতে বলছে সবাই। কি খাবে? রাখির হাঁপানি। মরে যাবে? যাক। ছেলেদুটোকে মামার বাড়ি রেখে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে।

এই শোনো।

রাখি পাঁজরে খোঁচা দিল।

জিতু চোখ খুলে তাকালো।

আজ বিকাল থেকে গন্ধ পাচ্ছি... বেশি না... অল্প....

জিতু'র মুখটা আনন্দে জ্বলে উঠল। তড়াক করে উঠে বলল, তাই?

রাখি মরবে না তবে। অথচ একটু আগেই কি যেন চাইছিল... ওই এগারোটা রুটির মত...

জিতু আবার চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। অল্প অল্প শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আনন্দে। উত্তেজনায়। রাখি পাশে থাকলে সে সব পারে। রাখি তার বুকে মাথা দিয়ে শুয়ে।

জিতু জিজ্ঞাসা করল, শ্বাসকষ্ট?

রাখি বলল, অল্প অল্প...

জিতু বলল, কাজে যেও না ক'দিন....

রাখি হাসল, চা খাবে তো....

জিতুর শ্বাসকষ্টটা বুক খামচে ধরল। কান্না পাচ্ছে।

Sourav Bhatta

হালখাতা

বাবার লটারীর দোকানে বসে আছে তিন্নি। সে ক্লাস টু-তে পড়ে। বাবার দোকানে হালখাতা করতে কেউ আসে না। রাস্তায় প্রচুর ভিড়। সবাই কি সুন্দর সুন্দর সেজে রাস্তায় বেরিয়েছে। বাচ্চুকাকার সোনার দোকানে উপচে পড়ছে ভিড়। সরবত, ফুচকা কত কি খাচ্ছে সবাই। তিন্নিও মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল। চারটে ফুচকা আর ম্যাঙ্গো ফ্লেভার সরবত খেয়েছে।

তিন্নি বাবার দোকানের পাশে একটা টুলে বসে আছে। দোকান কোথায়? এটা তো একটা বড় ছাতা। তার তলায় একটা টেবিল। টেবিলে রাখা কত কত টিকিট। কেউ কেউ অনেক টাকা পায় নাকি। বাবা পায় না। বাবা কাটে না।

বাস দাঁড়ালো একটা। ৮৫, এটা কাঁচরাপাড়া থেকে ব্যারাকপুর যায়। একজন দাদু নামল। হাতে লাঠি। পা অল্প অল্প কাঁপছে। নেমেই বলল, আমি একটু বসব?

তিন্নি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বলল, বোসো... তোমার কি সুগার কমে যাচ্ছে?

এই অসুখটা তিন্নি জানে। তার ঠাম্মির হয়। তার মা একটা হোটেলে বাসন মাজতে যায়। তাকে শিখিয়ে গেছে, ঠাম্মির ওরকম হলেই যেন সে চিনি খাইয়ে দেয়।

Sourav Bhattacharya

তিন্নি দৌড়ে পাশে রতন জেঠুর চায়ের দোকানে গিয়ে বলল, শিগগিরই আমায় চিনি দাও জেঠু... দাদুটার সুগার কমে যাচ্ছে...

এক মুঠো চিনি এনে দাদুকে বলল, হাঁ করো..

দাদু কিছুর বলার আগেই নিজেই মুখটা হাঁ করিয়ে চিনিটা পুরে দিয়ে বলল, এবার চুপ করে চোখ বন্ধ করে বসে থাকো। আমি একশো গুনছি, দেখো তুমি ঠিক হয়ে যাবে।

তিন্নি চোখ বন্ধ করে এক, দুই, তিন, চার গুনে চলেছে। এক একবার আড়চোখে দেখে নিচ্ছে দাদু চোখ খুলেছে কিনা। দাদুর চোখ বন্ধ।

একটু পর যতীন রায়, বয়েস ছেষট্টি ছুঁয়েছে, তিন্নির হাতটা ধরে বলল, আমায় বাঁচালে গো মা আজ..

তিন্নির বাবা এতক্ষণে কথা বলল, ওর ঠাকুমার ডায়াবেটিস তো... ও জানে এসব...

তিন্নি বলল, দাদু তুমি আমার বাবার দোকানে হালখাতা করবে? বাবার দোকানে কেউ হালখাতা করেনি দেখো না!।

তিন্নির বাবা লজ্জায় বলে উঠল, ছি ছি... মেশোমশাই আপনি ওর কথা শুনবেন না.... তিন্নি ওরকম বলে না.... তুমি মায়ের কাছে যাও...

যতীন রায় বলল, না না, আমি তো আজ লটারির টিকিট কিনবই... আজ নতুন বছরের প্রথম দিন... দাও দাও তুমি....

তিন্নি বাবার কানে কানে কিছু বলল। অমিত তিন্নির হাতে টাকা দিল। তিন্নি রাস্তা পেরিয়ে ওপারের দোকানে চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, দাদু তুমি চলে যেও না জেনো.... আমি আসছি...

তিন্নি ফিরল একটা কেক নিয়ে। বাপুজী কেক। দাদুর হাতে দিয়ে বলল, আমরা তো সরবত ফুচকা করতে পারিনি। তুমি এটা খেও।

দাদু সজল চোখে তিন্নিকে আদর করে বলল, অনেক বড় হও মা।

Sourav Bhattacharya

তিন্নি অবাক হয়ে দেখল দাদু কত টিকিট কেটেছে!

এর কয়েক দিন পর অমিত দেখল তিন্নি একটা নতুন স্কুলব্যাগ নিয়ে ঢুকছে। অমিত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে দিল তোকে তিন্নি?

তিন্নি বলল, সেই দাদুটা গো। দাদুর নাকি লটারিতে পাঁ... চ... শো টাকা উঠেছে। অনেক টাকা না বাবা?

অমিত বলল, অনেক মা... অনেক।

Sourav Bhattacharya

দশকৌণিক

সানাই বাজছে বেহাগে। লগ্ন সন্ধ্যায়। এই তো লগ্ন। এই তো সন্ধ্যা। বেহাগের সঙ্গে শুরু হল মন্ত্র উচ্চারণ।

ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, একটু দূরে, যাদের হৃদয় এক সুরে বাঁধা পড়েছে, কিন্তু সমাজ দেখেও দেখেনি। কোনো মন্ত্রও নাকি লেখা হয়নি ওদের জন্যে। তাদের হিতের জন্যে কোনো পুরোহিতের সন্ধান দিতে পারেনি কেউ।

ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। হাতদুটো ধরা। না হয় এভাবেই হোক। আগুন সাক্ষী। আগুন তো দশকৌণিক। দেবে না সাক্ষী?

মন্ত্রোচ্চারণ আসছে ভিড় ভেদ করে; হাসি, হইচই ভেদ করে। তারা একবার নিজেদের দিকে দেখল আড়চোখে। শ্রবণ দশকৌণিক। সানাইয়ের লয় দ্রুত। দু'জনের হৃৎপিণ্ডের দৌড়। তানে মেতেছে বিসমিল্লাহ্। বেহাগ আছড়ে পড়ছে বুকের অমসৃণ তটে। সুখ এসেছে। যেন পরিযায়ী পাখি।

Sourav Bhattacharya

মন্ত্রে বাধা পড়ছে। দু'জনে দেখতে পাচ্ছে, সুক্ষ্ম সোনালী সুতো। মীরা গেয়েছিলেন, চোখের জলে সিঞ্চন করে প্রেমের বীজে অঙ্কুর এনেছিলেন। মীরা! নূপুরের শব্দ আসছে কানে। হৃদয়তটে মীরা সুফি সাধকের মত দুটো হাত আকাশের দিকে তুলে ঘুরছে। এ নাচও দশকৌণিক।

সানাই বাজছে জয়জয়ন্তীতে। পাঁজরগুলো গলে গলে মিশে যাচ্ছে জলে। নোনতা জলে। হাতের আঙুলে জমছে ঘাম। আনন্দের মাদল বুকে। পাগল হয়ে যাবে যে!

একজন একজনের চোখে তাকালো। শুকনো চোখে জমে এত জল! মীরা বুঝল। আর বুঝল রুমি। রুমি বুক ঠেকিয়ে দাঁড়ালো দু'জনের বুকে। জড়িয়ে ধরল। বলল কানে কানে, ভালোবাসার শরীরে ডানার ঝাপট।

সাতপাকে কে ঘোরাবে?

একজন দাঁড়ালো। আরেকজন গেল একবার জল আনতে। একবার গেল কফি আনতে। একবার গেল খোঁজ নিতে, এর-ওর-তার। শেষে আবার আনল জল। ঘুরে নিল সাতবার। যে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যে, একা, কেউ জানে না, জানে শুধু রুমি আর মীরা, সে লজ্জায় হল লাল। লজ্জায়, হাসির রেখা পানপাতা হল, বুক উথলে ওঠা কান্নাকে আড়াল করে।

আবার এসে দাঁড়ালো পাশে। এবার সিঁদুর।

বিয়ের মণ্ডপে লালগুড়ো গড়িয়ে নামছে সিঁথি বেয়ে কপাল। তাদের সিঁদুর কই?

একে তাকালো অন্যের দিকে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। দু'জনেরই। এই শীতেও। শীত কই?

ভীমপলাশে বিঁধে যাচ্ছে বুক।

একজন তাকালো। তর্জনী উদ্যত হল। সে আরেকজনের চুল ঠিক করার আছিলায় ছুঁলো কপাল। ভিড়ের মধ্যে চুরি করল ঠোঁটের আদর।

এই সিঁদুর। এই স্পর্শ। এইতেই বুকে উছলে উঠল রক্ত। কপাল লাল হল, লাল হল গাল। সিঁদুরের চেয়েও লাল।

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

একজন বড় বেশি আরেকজনের কাছে। ডিও-র গন্ধ মিশে যাচ্ছে। কার ডিও-র গন্ধ কোনটা? কার স্বপ্ন কোনটা? কার ব্যথার রঙ কোনটা? সব মিলে মিশে এক।

পেছন থেকে হঠাৎ কে যেন বলল, শুনেছেন, সুপ্রিমকোর্ট থেকে সমকামী বিয়ে নিয়ে রায় দিতে চলেছে। সমাজটা উচ্ছন্নে দিয়েই ছাড়বে এরা!

দু'জনে চমকে উঠল। এতক্ষণ সানাইয়ে ডুবে গিয়েছিল সমাজ। সুর মর্মভেদী। মর্মে জাগে সত্য। সমাজে জাগে ভয়।

একজনের চোখের কোণ বেয়ে নামছে তুষারধ্বস। আরেকজন চুপ। তুষারধ্বস থামাবে কে?

বিসমিল্লাহ্ বাজাচ্ছে দরবারি।

রুমি উড়ছে সাদা চিল হয়ে। মীরা নীলাকাশে চাঁদ হয়ে স্থির।

দু'জনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। ছাড়বে না জায়গা। থাকবে দাঁতে দাঁত চিপে। সমাজ নেই, সংসার নেই। দু'জন মানুষের মধ্যে দাঁড়াবে এমন স্থান বেঁচে নেই একটুও। এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ওরা।

ভালোবাসা দশকৌণিক।

Sourav Bhattacharya

পাঁজর

ঠিক কোথায় খেইটা হারিয়ে গেল। রমেশ বুঝলই না। পুরো জীবনটাই যেন হুস করে এক ভাঁড় চায়ের মত ফুরিয়ে গেল। মানুষ কতবার খোলস ত্যাগ করে। নতুন মানুষ হয়। বারবার নতুন হয়। কিন্তু ভালো লাগে কি? আগের বারের খাঁচার জন্য মন খারাপ করে না?

রমেশ মন খারাপ লাগলে পুরী আসে। দোকান বন্ধ থাকে। চায়ের দোকান। কাঁচরাপাড়ায়। বেশ চালু দোকান। রমেশ মানুষের রুচি বোঝে। রুচিভেদে মানুষ ভেদ। রমেশ কত মানুষের কথা শোনে। এক এক সময় হাঁপিয়ে ওঠে। মানুষের সমস্যার শেষ নেই। কত সমস্যা মানুষ নিজেই বানায়। নিজেকে খোলামেলায় রাখতে মানুষ ভয় পায়। হারিয়ে ফেলার ভয়।

রমেশ আজ অনেক সকালে এসেছে বীচে। রমেশের কেউ নেই। বউ ছেলে চার বছরের মধ্যে মরেছে। রমেশ বলে আমার বুকে পাঁজরে হাড় নেই, শ্মশানের কাঠ দিয়ে বানানো। চিতা জ্বলছে। মানুষের বয়েস হলে পাঁজরের হাড় বদলে যায়। কাউকে না কাউকে হারায় মানুষ। তার স্মৃতি দিয়ে একটা করে পাঁজর তৈরি হয়। মাঝে মাঝে টনটন করে। কাউকে বলা যায় না। দোকান ফাঁকা। একটা কাক ডাকছে হয় তো। হঠাৎ করে একটা পাঁজর টনটন করে উঠল। যেন পাঁজরে ঠুকরে দিল কেউ। এ হয়, সবার হয়। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। নিজেকে না বুঝতে পারলে

Sourav Bhattacharya

মানুষ অকারণে অস্থির হয়। নিজেকে না বোঝাতে পারলে অভিমানী হয়। খুব অভিমান জমলে পুরী চলে আসে রমেশ। সমুদ্রের হাতে অঢেল সময়।

রমেশ এবার একা আসেনি। শ্যামা ঘুমাচ্ছে হোটেলে। শ্যামাও একা। বর ছেড়ে গেছে। ছেলেপুলে নেই। নার্সিংহোমে আয়ার কাজ করে। তার দোকানে চায়ের টানে আসত। ক্রমে চায়ের টানের উপর হালকা সর পড়ল, তার টানের। রমেশের প্রথম প্রথম সংকোচ হত। কিন্তু কেন হবে? সেদিন চায়ের দোকানে বসে। মুষুলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি হলে মানুষ বাইরে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের মধ্যে সেঁধোয়। ঘরের মধ্যে থাকতে থাকতে পুরোনো স্মৃতির খড় উঠিয়ে পুরোনো উষ্মা খোঁজে। রমেশ হাতড়ে হাতড়ে নিজের ভিতর ঢুকছিল, এমন সময় অত বৃষ্টির মধ্যে সাতাশ নাম্বার বাস থেকে নামল শ্যামা। সালোয়ারকামিজ পুরো ভিজে চপচপ। তার দোকানে এসে দাঁড়ালো। রমেশ পুড়ল। অনেকদিন পর পুড়তে পুড়তে বুঝল বাঁচার রসদ ফুরিয়ে যায়নি। সে নিজেই বেচাকেনা বন্ধ করে অসময়ে ঝাঁপ ফেলেছিল। শ্যামা বলল, বড় গ্লাসে চা দাও রমেশদা। এই নাও আদা এনেছি, দুজনের মত বসাও। আমি তোমার দোকানের ভিতরে গিয়ে শুকনো জামা পরে নিই।

চায়ের দোকানের ভিতরে একটা ছোটো ঘর। ভাঁড়ার ঘর। কি অনায়াসে ঢুকে গেল মেয়েটা। যেন রোজ যায়। যেন কি অধিকার তার সব কিছুতেই। রমেশের মনে হল সে যেন আকাশ ভাঙা বৃষ্টিঝরা পাহাড়ে ঝাঁপ দিল উত্তাল তিস্তায়। রমেশ জানলই না কখন সে এসে দাঁড়িয়েছে সে অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরে। চোখ তীরের মত বিঁধেছিল শ্যামার নাভিতে। অত অন্ধকারে মানুষ দেখে কি আলোয়? শ্যামা দাঁড়িয়ে, একটুও অপ্রস্তুত নয়। যেন অপেক্ষা করেছিল। শ্যামা হেসেছিল শুধু। বাইরে উনুনে চাপানো ওথলানো দুধপোড়া গন্ধ যায়নি ভাঁড়ার ঘর অবধি। দরদী বৃষ্টি এসে আগুনের আঁচ কমিয়ে দিয়েছিল। সময় দিয়েছিল তাদের।

রমেশ সমুদ্রের জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে। শ্যামা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে অনেক কিছু। আগের মত করে নয়। শ্যামার মত করে। তারা বিয়ের কথা বলে না। নিজেদের কথা বলে। ফেলে আসা জীবনের কথা। নিজেদের পাঁজরের কথা। ভবিষ্যতের কথা বলে না তারা। ভবিষ্যৎ মানে হাওয়া। সেখানে বীজ বুনে কি হবে? জীবন মানে এই তো। এই যে একটার পর একটা ঢেউ উঠে ফিরে যাওয়া। এইটুকু তো জীবন। মহাসমুদ্রের হিসাব রাখে না ঢেউ। বাতাসের সঙ্গে মিশে যেটুকু অস্তিত্ব, সেটুকুতেই তার খেলা শেষ।

Sourav Bhattacharya

রমেশ ছোটো গ্লাসে চা নিল শ্যামার জন্য। সঙ্গে দুটো বিস্কুট। শ্যামা ঘুম ভাঙলেও উঠবে না। অপেক্ষা করবে তার জন্য। দু গ্লাস গরম চায়ের জন্য। এইটুকু অপেক্ষা জীবনে সবার জন্য কোথাও রাখা থাক, জগন্নাথদেবের কাছে এই প্রার্থনা। রমেশ কোনোদিন নিজের একার জন্য কিছু চায় না। মা শিখিয়েছিলেন।

রমেশ ফিরছে। সমুদ্রকে বলে গেল, আসছি।

Sourav Bhattacharya

ভ্রম রে ভ্রমিত মন

যত্ন করে মাদুরটা পেতে বলল, বসো। মাদুরটা পাততে পাততে লতার নিজেরই মনে হল শেষ কবে এত যত্ন করে কিছু করেছে? যত্ন করতে ভুলে যাওয়া মানুষ হারিয়ে যায় হঠাৎ। লতা যেমন যাচ্ছিল।

লতার শ্বশুরবাড়ির বাজির ব্যবসা। বাড়ির সামনেই দোকান। লতা বসে, অভিজিৎ বসে, শাশুড়ী বসে। লতা কিছু সেলাইয়ের কাজ করে। সে তেমন বড়সড় কিছু নয়।

সুজন মাদুরে বসে বলল, পড়াশোনাটা যে কেন ছেড়ে দিলি রে মা... অন্তত মাধ্যমিকটা যদি....

থাক না জেঠু। আমি চা আনি। তুমি বসো। আসছি।

সুজন মাস্টারের থেকেও বেশি কিছু ছিল লতাদের পরিবারের। লতার বাবা খুব শ্রদ্ধা করত। প্রাইমারি স্কুলের হেডস্যার ছিল সুজন। অকৃতদার। গ্রামে একটা লাইব্রেরি করেছেন। ওই সুজনের সন্তান। যা শ্রম আর অর্থ দিয়েছেন! ও পরিবার থাকলে সম্ভব ছিল না।

Sourav Bhattacharya

অভিজিৎ এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে গেছে। শাশুড়ি নেই, ননদের বাড়ি গেছে। ওদের ওখানে মানসিক কালীপুজো। লতা চা নিয়ে ঢুকল।

সুজন চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে সস্নেহে লতার দিকে তাকিয়ে বলল, অনেক আশা ছিল রে মা তোকে নিয়ে... তোর বাবাকেও বলেছিলাম....

লতার কাছে এ কথাগুলো নিরর্থক। মা মারা গেল। বাবা আবার বিয়ে করল। তখন বাবা যে করে হোক তাকে আর দিদিকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচে। সুজন জেঠু সংসার বোঝে না। সারাটা সংসার যেন ওঁর স্কুল। সবই যেন দুই-দুগুনে চার হয়। মানুষটাকে দেখলে মায়া লাগে লতার। এত ভালোবাসে তাকে। অথচ মানুষটা যা চায় তা সে দিতে পারে না। সে ছাত্রী ভালো ছিল। কিন্তু শুধু ছাত্রী হলেই কি হয়? টাকা ভাগ্য লাগে না?

সুজন অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। লতা জেঠুর এ স্বভাব জানে। ভাবছে কিছু একটা। এখন প্রশ্ন করলে কাটা কাটা উত্তর দেবে। সুজন চায়ের কাপটা রাখতে লতা বলল, একটা জায়গায় যাবে?

সুজন কেন, কোথায়, কি করতে কিচ্ছু প্রশ্ন না করেই উঠে দাঁড়িয়ে সোজা বলল, চ....

লতা হাসল। মানুষটা বাচ্চাই রয়ে গেল। যেন ছোটো হলে এখনই কোলে উঠে যেত নির্দ্বিধায়।

লতা আর সুজন এসে একটা বাঁধানো পুকুরের ধারে দাঁড়ালো। লতা বলল, এটা হল চৈতন্যডোবা। হালিশহরে এটা দেখতে সবাই আসে। আগেরবার তোমায় রামপ্রসাদের ভিটে, নিগমানন্দের আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলাম মনে আছে? সেবার এটা দেখা হয়নি। এসো। এটা নাকি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের গুরুদেব ঈশ্বরপুরীর ভিটে। চৈতন্যদেব এখানে এসে এই পুকুরে নাকি স্নান করেছিলেন।

সুজন বলল, শুনেছি জায়গাটার নাম। সুজন নমস্কার করে না প্রকাশ্যে। মুগ্ধ হয়। লতা সুজনের মুগ্ধ চোখ, বিরক্ত কপাল, বিভ্রান্ত মণির চলন জানে, বুঝতে পারে।

সুজন বলল, বোস।

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

লতা আর সুজন পাশাপাশি বসল। শীত পড়েনি এখনও, তবে বাতাস বলছে দেরি নেই আর বেশি। দুপুরের রোদও তেমন চড়া নয়।

লতা বলল, জেঠু, নাম করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? এইখানে অনেকে দেখি জপ করে। আমার কেমন সন্দেহ হয়। আমার শাশুড়িও মালা জপে। এতে হয় কিছু?

সুজন বলল, জপ করে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না... কিছু করেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না.... ঈশ্বরকে পাওয়ার ইচ্ছাতেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই ইচ্ছাটা যদি আন্তরিক হয় তবে সেকি এমনি এমনি নিশ্চল হয়ে থাকবে? তাই কেউ জপে, কেউ ধ্যান করে... আসলে ইচ্ছাটাই আসল রে মা....

লতা হঠাৎ উঠে বলল, চলো, আরেকটা জায়গায় যাবে?

সুজন তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চ....

টোটো ডাকল। সুজন আর লতা পাশাপাশি বসল। লতা টোটো চালককে বলল, দাদা শিবমন্দির ঘাটে চলুন....

চালক বলল, রাসমণি ঘাট বলছেন?

লতা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ....

সুজন ভুরু কুঁচকে সকৌতুক তাকিয়ে... লতা বলল, দুটোই বলে। আসলে কাছাকাছিই এখানে রাসমণির ভিটে ছিল। একটু পরেই দেখবে বাগমোড় বলে একটা জায়গা আসবে, একটা রাসমণির মূর্তিও বসেছে।

সুজন হাসল। টোটো চলছে। লতা কথা বলছে,

জানো জেঠু আমার শাশুড়ি ভালো মানুষ, কিন্তু ঠিক মানুষ নয়....

সুজন হাসল। বলল, বাব্বা, তুই এই দুটোর পার্থক্য করতে শিখে গেছিস? তুই তো অনেক বড় হয়ে গেলি রে মা....

Sourav Bhattacharya

লতা বলল, হ্যাঁ গো... মানুষটা ঠিক হলে ও আরো পড়াশোনা করতে পারত... ওর অঙ্কে কি পরিষ্কার মাথা জানো.... এক এক সময় দুঃখ করে....

সুজন বলল, ভালো তো....

লতা বলল, মানে?

সুজন বলল, দুঃখ নেই, ক্ষোভ নেই, এমন মানুষ কেউ কি আছে রে... কিন্তু সে দুঃখ, কি ক্ষোভ জানাবার একটা জায়গা তো তার আছে... সেইটা খুব বড় কথা রে...

লতা বলল, হুম, তুমি যে কেন একা রয়ে গেলে...

টোটো বাগমোড় এসে গেল... সুজন বলল, এই তো রাসমণির স্ট্যাচুটা... এইটাই তো বলছিলি...

লতা বুঝল সুজন এ প্রসঙ্গে কথা বলবে না। লতা বলল, হ্যাঁ, এই যে সামনে রাস্তাটা এটা কল্যাণী গেছে... ডানদিকে সোজা গেলে কাঁচরাপাড়া রেল স্টেশান...

টোটো বাঁদিকে ঘুরে কিছুটা এগিয়ে একটা গলিতে ঢুকল। কোনো বাড়ির অবস্থাই তেমন খুব সচ্ছল নয়। অনেক বাড়ির সামনেই ফুচকার দোকান। বাড়ির বউরাই অনেকে দোকানে বসে। পুরুষেরাও আছে। সুজন অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ রে, এতো পুরো ফুচকাপাড়া...

লতা হেসে বলল, হ্যাঁ গো জেঠু। সবাই তাই বলে। এখানে কতরকমের যে ফুচকা পাওয়া যায় কি বলব। দই, আচার, মিষ্টি.... তুমি ভাবতে পারো যে এখনও এখানে দশটাকায় বারোটা ফুচকা পাওয়া যায়!

সুজন চোখ বড় বড় করে বলল, বলিস কি রে.... দশ টাকায় বারোটা?

লতা বলল, খাবে?

সুজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপট দুঃখের অভিনয় করে বলল, দু'বার জণ্ডিস হয়ে গেল যে রে....

Sourav Bhattacharya

টোটো এসে গঙ্গার ধারে দাঁড়ালো। সুজনের মনের উপর থেকে যেন কে কাপড় সরিয়ে দিল। সব অন্ধকার আলো আলো হয়ে গেল। সংসারে চলতে চলতে চোখেমুখে কাপড় জড়িয়ে যায় কখন মানুষ টের পায় না। ব্যথা হয়। কিন্তু মানুষ ব্যথিত হয় না।

লতার কি উচ্ছ্বাস। সে যেন পারলে হাততালি দিয়ে নেচে ওঠে। চোখ বড় করে বলল, জানো এখানে বিশ্বকর্মা পুজোর সময় বাইচ প্রতিযোগীতা হয়.... কি স্পিডে নৌকাগুলো চালায় তোমায় কি বলব জেঠু.... এই যে শিবমন্দিরটা দেখছ... এ খুব পুরোনো জানো... এই মন্দিরের মধ্যে এসে দাঁড়ালে আমার কেমন মনে হয় আমি কাশীর শিবের মন্দিরে এসেছি। এসো।

সুজন আর লতা শিবমন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠল। মন্দিরের ভিতরটা সত্যিই বড় অন্যরকম। সাদা শিবলিঙ্গ। এরকম খুব কম দেখা যায়। মন্দিরের ভিতরটা কি ঠাণ্ডা! সুজন বসল হাঁটু মুড়ে। প্রার্থনা করবে। কিন্তু কি চাইবে? চাওয়া মানে কি প্রার্থনা? সব চাওয়ার বাইরে না গেলে প্রার্থনা জন্মায় নাকি? মন শান্ত না হলে আর তেত্রিশ কোটি দেবতা কেন, কয়েকশো কোটি দেবতাতেও কিচ্ছু হবে না। অন্তর্যামীকে খোঁজ মন, অন্তর্যামীকে খোঁজ। সেই এক। তাঁর সামনে একা দাঁড়াতে হয়। একা হ মন। একা হ।

সুজন চোখ খুলে দেখে লতা নেই পাশে। বাইরে এসে চটি পায়ে দিতে গিয়ে দেখল লতার চটিটা নেই। কোথায় গেল? ওই তো গঙ্গার ধারে বসে।

কিরে? সুজন বসতে বসতে বলল।

আমি দেখলাম তুমি ডুবে গেছ। আমি জানি তো ইনিই আমার কাশীর শিব। দারুণ না?

সুজন মাথা নেড়ে বলল, ওটা কি মন্দির রে?

লতা বলল, ওটা রামকৃষ্ণ আশ্রম, অনেকে বলে জগদম্বা আশ্রম। প্রাইভেট। বেলুড়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। ওই দেখো এদিকে কালী মন্দির আর পাশে ওটা দোতলায় বেলুড়ের আদলে একটা রামকৃষ্ণ মন্দির হচ্ছে। যাবে?

সুজন বলল, নাহ্ রে, এখানেই বসি। চা খাবি?

Sourav Bhattacharya

দুটো কাগজের কাপে চা দিয়ে গেল একটা ছেলে পাশের দোকান থেকে।

গঙ্গার উপর পশ্চিমের সূর্যের আলো এসে পড়েছে। জলের উপর যেন গলা সোনা। নৌকা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। জেলেদের নৌকা। একটু দূরে ঈশ্বরগুপ্ত ব্রীজটা দেখা যাচ্ছে। লতা চুপ করে আছে। সুজন বলল, অভিজিৎ তোকে বোঝে?

লতা বলল, বোঝে। যতটা বুঝলে চলে যায়। কেউ কি আমরা কাউকে পুরো বুঝি বলো? তবে ও ওর বাবাকে খুব মিস করে।

ভালো ছেলেটা। ও পড়তে বলে না তোকে?

লতা বলল, না। আমি ওসব কথা তুলতে দিই না। কি জানো জেঠু, জানি তুমি শুনলে রাগ করবে, তবে জানো বই পড়ে যা না জানা যায়, তার চাইতে অনেক বেশি জানা যায় মানুষকে পড়লে... তাই না?

সুজন বলল, মানুষ বড় জটিল তত্ত্ব রে, নাগাল পেতে কিছু তো পড়তে হয়?

লতা তাকালো সুজনের চোখের দিকে। এত মিষ্টি চাহনি মেয়েটার! লতা বলল, মানুষের বুকের ভিতরটা পড়লে বাইরেটা সোজা হয় যায় জেঠু... তুমি বলেছিলে না.... গরুর গাড়ির চাকার মত মানুষের মনের মধ্যে একটা কেন্দ্র আছে.. সেইখানে গেলে মানুষটা সোজা... যত গোল পরিধি জুড়ে.... আমি তাই মানুষের পরিধি জুড়ে পরিক্রমা করি না.. কেন্দ্রে ডুব দিই....

সুজন বলল, পারিস?

লতা বলল, আমার বাবা চাইলে পারি... তুমি যার সামনে বসেছিলে এতক্ষণ... উপনিষদে আছে না গো... শান্তং শিবম অদ্বৈতম.. শান্ত মনেই মঙ্গল.. সেখানেই সব এক.... তাই তো...

সুজনের চোখে জল এলো... মেয়েটা স্কুল ছেড়েছে.... বিশ্বপিতার স্কুল থেকে ছুটি নেয়নি তবে....

লতা বলল, চলো... আরেক জায়গায় যাই.. হাঁটবে?

Sourav Bhattacharya

লতা আর সুজন হাঁটতে শুরু করল। কোন কোন দোকানে বাজি সাপ্লাই করে তারা দেখালো। এখানে নাকি কলকাতা থেকেও লোক আসে বাজি কিনতে। সত্যিই এত এত বাজির দোকান! লতা বলল ভীষণ সস্তায় নাকি বাজি পাওয়া যায় এখানে। কালীপুজোর আগে দোকানের এত ভিড় লেগে যায় যেন সেলের মার্কেট।

একটা খুব পুরোনো কৃষ্ণমন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালো তারা। সামনে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের স্ট্যাচু। খুব সুন্দর। সামনেটা দেখলে মনে হবে যেন কোনো পুরোনো রাজবাড়ী কি জমিদার বাড়িতে এসেছে। সামনে বড় মাঠ। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আবার একটা উদ্যান তার ভিতর। তার কেন্দ্রে সেই কৃষ্ণমন্দির।

লতা বলল, সাবর্ণ রায়চৌধুরীরদের বাড়ি নাকি এখনও আছে হালিশহরে। তবে এটা এদিকে না, সেটা রামপ্রসাদের ভিটের দিকে। তাদের বংশধরদের কেউ কেউ থাকেন সেখানে এখনও।

জুতো খুলে মন্দিরের চাতালে উঠল সুজন আর লতা। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মন্দিরের গায়ে বিষ্ণুপুরের মন্দিরের মত টেরাকোটার কাজ। মন্দিরটাই বিষ্ণুপুরের মন্দিরের আদলে বানানো। মন্দিরের গর্ভগৃহে রাধামাধব। কি উজ্জ্বল, কি স্নিগ্ধ মুখ! সুজনের মনটা আনন্দে ভরে উঠল। শিব মানে শান্ত। কৃষ্ণ মানে আনন্দ। মা মানে শক্তি। এ সুজনের তত্ত্ব। কৃষ্ণ আনন্দ। সুখ দুঃখের বৈঠা বাওয়া আনন্দ। হাল ধরে থাকেন গোবিন্দ। নইলে ঝড়ের মুখে পড়ে নৌকা ডোবে। সুজন মনে মনে চন্দন মাখল। সারা মন জুড়ে চন্দনের গন্ধ। সন্ধ্যারতি শুরু হল। অনাড়ম্বর অতি সাদাসিধা আরতি। মহামন্ত্র গাইছেন এক বৃদ্ধা। কি তৃপ্তিতে ভরা মুখ। সব হারালে এমন তৃপ্তি জন্মায়। যখন ভয় থাকে না হারানোর। ক্ষোভ থাকে না কোন কিছু না পাওয়ার। লোভ থাকে না দখল করার সংসারে এক চিলতে সুখও। সে আনন্দ দেন গোবিন্দ। বৃদ্ধার মুখে কৃষ্ণনাম... হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে... হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে..... চৈতন্যদেব লিখছেন এই নামে চেতনার দর্পণে জমা ধুলো সরে যায়, মঙ্গল চিন্তা বুদ্ধির উপর পড়ে স্নিগ্ধ চাঁদের আলো, আনন্দ সমুদ্রে জাগে ঢেউয়ের পরে ঢেউ, সংসারের জ্বালা মেটে.... সব শুদ্ধ হয়....

লতা আর সুজন বাগমোড়ে দাঁড়িয়ে। লতার চোখ ছলছল করছে। সুজন এখান থেকে ৮৫ নাম্বার কি ২৭ নাম্বার বাস ধরে চলে যাবে কাঁচরাপাড়া স্টেশান। অটো বা টোটো নিলেও হয়। কিন্তু

Sourav Bhattacharya

সুজন বাসে উঠবে। বাসে অনেক মানুষ। সুজন মানুষ দেখে। লতাও মানুষ দেখে। একজন পড়ে। একজন ডোবে। লতা পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। বারণ শুনবে না। ধরা গলায় বলল, আবার এসো, আমার দিব্যি রইল। সুজনের নাকটা টাটিয়ে উঠল। যে ক'জন মানুষের জন্য পৃথিবী ছাড়তে ইচ্ছা করে না লতা তাদের মধ্যে প্রথম। সে লতার মাথায় হাত রেখে বলল, আসি মা। এমনই থাকিস, জগদীশকে সঙ্গে নিয়ে। তবেই জগতে থেকে জগতের মর্ম জানা যায়।

Sourav Bhattacharya

দুজনে

বাচ্চাটা দুটো তুবড়ি, আর চারটে ফুলঝুরি জ্বালানোর পর মায়ের মুখের দিকে তাকালো। বুঝল আর নেই। মা তাকে নিয়ে ছাদে উঠল। কত কত বাড়িতে টুনি লাইট লাগানো। সামনের পুকুরটা জ্বলজ্বল করছে সেগুলোর প্রতিফলনে।

মা আর বাচ্চাটা পাশাপাশি বসে ছাদে। তাদের বাড়ির প্রদীপগুলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। নেভা প্রদীপ কয়েকটা শিশিরে ভিজছে। চারদিকে এত এত বাজি ফাটছে। আকাশে হুস হুস করে বাজি উঠে তারার ঝরণার মত ফেটে যাচ্ছে। বাচ্চাটা উঠে গিয়ে ফুরিয়ে যাওয়া তুবড়ি দুটো সামনে এনে রাখল। মা তাকালো, কিছু বলল না।

হঠাৎ মা উঠে গিয়ে ছাদের কার্ণিশের দিকে গেল। ডাকল, বাবু এদিকে দেখে যা!

বাচ্চাটা দৌড়ে গেল। মা নীচে তাদের কুয়োপাড়ের ঝোপের মধ্যে দেখিয়ে বলল, দেখ!

ঝোপের মধ্যে জোনাকির মেলা বসেছে তখন।

বাচ্চাটা মায়ের মুখের দিকে তাকালো। অন্ধকারে মায়ের মুখটা কষ্ট কষ্ট। বাচ্চাটা মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক যেন টুনিলাইট... না না, তারাবাজি.. না মা!!

Sourav Bhattacharya

মা তাকে নিজের দিকে আরো টেনে নিয়ে বলল, তাই না!

অন্ধকারে দুজনে জড়াজড়ি করে এত কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালো যে কষ্টটা দাঁড়াবার মত ফাঁকই খুঁজে পেল না।

Sourav Bhattacharya

মন বাঁচুক

রান্না করতে সকাল থেকেই ইচ্ছা করছে না। সকাল থেকে শুয়ে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সারা শরীর দিয়ে মনে হচ্ছে পোকার সারি হেঁটে যাচ্ছে। জানলাটা খোলা। রাস্তা পাশে। দিনদুনিয়া তার মত জেগে। কত উৎসাহ মানুষের। তার কিছুতেই কোনো উৎসাহ নেই। এরকম মাসের পর মাস চলে। তবু নিজেকে টেনে হিঁচড়ে স্টেশানে নিয়ে যায়। ট্রেনে ওঠায়। গলায় জোর এনে চীৎকার করে, দিলখুশ... দিলখুশ... গরম গরম... এখনই খান... বাড়ি নিয়ে যান... টাটকা দিলখুশ...

খড়দা স্টেশানে বসে। একটা কেক আর চা ছাড়া সকাল থেকে কিছু পেটে পড়েনি। পাঁচটা ট্রেনে কাজ করেছে মাত্র। গাছের পাতাগুলোর শব্দ আসছে। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। ইচ্ছা করছে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে গেলেই অন্যজগৎ। তখন ঘরবার কই। তার সাতকূলে কেউ নেই। সে যেন হাওয়া থেকে জন্মেছে। মাটি ফুঁড়ে। খিদে পাচ্ছে।

চেনা ভাতের হোটেল। চেনা ট্যালটেলে ঝোল, ডাল, মাছভাজা, জল। সব বিস্বাদ। ভাতের দানাগুলো রঙচটা। সাদা হতে হতে হলুদ হয়ে গেছে। জিভের উপর রাখলে ওরা বলে তাড়াতাড়ি গিলে ফেলো। লজ্জা দিও না। হোটেলের মালিক কথা বলে না। কানের উপর লোম। সুগারে খাওয়া শরীর। লোভ না মেটা চোখ। আঙুলগুলো শিকলের মত।

Sourav Bhattacharya

তার লোভ হয় না। শুধু বাঁচতে ইচ্ছা করে। এই লাইনে কাজ করতে করতে কতবার কাটা মাথা দেখল। দুঃখ হয়। ভীষণ কষ্ট হয়। আগে আগে গা পাক দিয়ে উঠত। এখন কিছুই হয় না। শুধু মনে হয় বাঁচতে পারত হয় তো। তার আবার বাঁচতে ইচ্ছা করে। মন সায় না দিলেও বাঁচতে ইচ্ছা করে। মনের মধ্যে ডুব দিয়ে পান্না কুড়িয়ে এনে জীবনকে সাজাতে ইচ্ছা করে। সংসারে কোনো সুখের দাবী সে করে না। কিন্তু বাঁচার অধিকারটুকু ছিনিয়ে নিতে এলে সে হিংস্র হয়ে ওঠে।

আবার স্টেশানে এসে বসল। নৈহাটি লোকাল আছে একটা ডাউনে এখন। দমদমে নেমে যাবে। নৈহাটি লোকালের কথা মাইকে বলল। আসছে তবে।

চোখ আটকালো আপের প্ল্যাটফর্মে। বুঁচকি না?

বুঁচকি তাদের পাড়ার মেয়ে। বিয়ে হয়েছে এদিকেই কোথাও। কিন্তু ও এরকম একা একা প্ল্যাটফর্মে ঘুরে কেন বেড়াচ্ছে? অবশ্য তার তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু বিবাহিত মেয়েদের দেখলে তার হিংসা হয়, ঈর্ষা হয়। মনে হয় সে তো তারও হতে পারত।

প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ করে বুঁচকির সামনে দাঁড়ালো। বুঁচকি থতমত খেল। ভয় পেলো যেন। তাকে দেখে বলল, খোকনদা, তুমি?

খোকন বলল, এখানে কি করছিস? বাড়ি যাবি?

বুঁচকি আমতা আমতা করছে। চোখ দুটো এত নরম হয়ে আছে যেন আঙুল দিলে বুক অবধি ডেবে যাবে। মনের সব কথা বেরিয়ে আসবে।

কিছু হয়েছে তোর?

বুঁচকি বোকার মত হেসে বলল, কি হবে আবার?

তোর শ্বশুরবাড়ি কোথায় যেন?

বেলঘরিয়া।

তবে?

Sourav Bhattacharya

তবে কিছু না, তুমি যাও... আমি ঠিক আছি...

না রে, আমার যেন মনে হচ্ছে তুই কিছু একটা বদ মতলবে এসেছিস...

বুঁচকি হেসে বলল, তুমি ঠেকাতে পারবে? কতক্ষণ পাহারা দেবে আমায়? তুমি বিয়ে করেছ?

না রে, মরতে মরতে বেঁচে ফিরলাম করোনায়...

হ্যাঁ গো, এই রোগটা যে কি করে দিল... ওর কাজটা নেই জানো... বাড়িতে বসে...

খোকন বলল, চা খাবি?

বুঁচকি বলল, চলো।

* * * * *

কি বলো তো খোকনদা, আমি ভেবেছিলাম সাময়িক, কেটে যাবে। সাইকেলে করে গার্ডেনরীচ এই বেলঘরিয়া থেকে রোজ যাওয়া যায় বলো? অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল। চোখমুখ শুকিয়ে একশা গো!

বুঁচকির শুকনো চোখে অল্প অল্প জল। চায়ের চিনিটা বেশি দিয়েছে। খোকন উঠল। দুটো বাপুজি কেক আনল। বাপুজি কেক তার বাবা-মায়ের মত। পেট ভরিয়ে আসছে সেই ভিক্ষা করে খাওয়া দিনগুলো থেকে। তারপর সাইকেলের দোকানে কাজ, হোটেলে কাজ, মিষ্টির দোকানে কাজ, মদের দোকানে কাজ। সকালবেলায় পেট ভরিয়েছে এই বাপুজি কেক। মায়ের আঁচলের মত শান্তি লাগে ভাবলে। মায়ের আঁচল কি জানে না, কিন্তু প্রাণ ঠাণ্ডা হওয়া শান্তি মানে মায়ের আঁচল।

বুঁচকি কিছু না বলেই হাত থেকে নিলো। মেয়েটা ভাবছে। চোখের জলটা গিলে ফেলেছে। খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ খায়নি। ভাতের পর কেক, নামছে না গলা থেকে। খোকন অল্প এক টুকরো কামড় বসালো। ডাউনে দুটো ট্রেন চলে গেল। নৈহাটি আর কৃষ্ণনগর। অনেকেই দিলখুশ খেতে পারত।

Sourav Bhattacharya

এখন কি করে চালাচ্ছিস তবে? বাচ্চা আছে না তোর একটা...

হ্যাঁ গো, এইটে পড়ে, ছেলে... টানতে পারছি না জানো...

এখন?

একটা নার্সিংহোমে কাজ নিয়েছি... ব্যারাকপুরে...

কোন নার্সিং হোম?... ব্যারাকপুরে আমার চেনা অনেক বন্ধু আছে রে...

বুঁচকি যেন অপ্রস্তুত হল। কেকটা গলা দিয়ে নামতে গিয়ে এক মুহূর্ত আটকে গেল। তারপর ঠেলে নীচে পাঠিয়ে বলল, উজ্জ্বল নার্সিং হোম।

খোকনের মনে হল উজ্জ্বল নার্সিং হোম বলে ব্যারাকপুরে কিছু নেই। তবে কি? পুরুষ বলেই কি এই চিন্তাটা সহজে এলো মাথায়? তবে এমন সেজেছে কেন? এত তো সাজে না? কিন্তু এখন তো দিনের বেলা। কি ভাবছে... এরকম ভাবনা কেন মাথায় আসে?

বুঁচকি বলল, খোকনদা তোমার কাছে দু'হাজার টাকা হবে?... ছেলেটার কিছু বই কিনতেই হবে গো...

খোকনের মনে হল দেওয়া উচিৎ। বলল, কিন্তু এখন তো নেই রে। তুই কাল এই সময়ে এখানে আয়, আমি আনব।

বুঁচকি বলল, বাবাকে কিছু বোলো না।

খোকন 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলল না। দু'জনেই চুপ করে বসে। কাক ডাকছে গাছের কোনো ডালে বসে। স্টেশানে রোদের হলকা আসছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে আবার খোকনের। করোনার পর থেকেই এটা হয়েছে। কিন্তু বুঁচকি। শুধু বুঁচকি কেন? এরকম সাজের মেয়ে তো সে দেখেছে। রাতও কাটিয়েছে। এরকম সেজে দুপুরে কে নার্সিংহোমে যায়? এরকম সাজা মেয়ে দেখলেই মানুষের ওরকম মেয়ে মনে হয়। এত মোটা লিপস্টিক। চোখের উপর এরকম চকচকে রঙ। কানের এত বড় চাকা দুল। শাড়িটাও তো কেমন। সব দেখা যায় স্পষ্ট। সায়া ব্লাউজ সব।

Sourav Bhattacharya

চমকে গেল। ঝাঁকুনিতে কাত হয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। বুঁচকি চলে গেছে। চায়ের দোকানে টাকাটা দেওয়া হয়নি। খোকন উঠে প্যান্টের পকেট থেকে টাকাটা বার করে দিতে গেলে দোকানি বলল, আপনার বোন দিয়ে গেছে।

বোন? বুঁচকি বোন? না-ও তো হতে পারত।

* * * * *

পর পর এক সপ্তাহ খোকন দু'হাজার টাকা নিয়ে স্টেশানে এসে বসে থাকল। বুঁচকি এলো না। খোকন ওর বাড়িতেও কাউকে কিছু বলল না। কিন্তু বুঁচকির ঋণটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। দিন দিন জ্বালাটা বাড়িয়ে যাচ্ছে। বুঁচকিকে আবার দেখতে চায়। সে কিছু সেরকম পাড়ায় গেল। মন নীচে নেমে যায় কত সহজেই। বুঁচকিকে খুঁজছে সে। সেকি দু'হাজার টাকার মূল্য কিনতে চাইছে? এত নীচ ভাবনা কি করে জন্মায় মনে? কিন্তু জন্মাচ্ছে তো। পাপ, পাপ। কিন্তু পাপ ছাড়া এতবড় জীবনে দেখলই বা কি সে? অল্প পাপ আর বেশি পাপ। পাপ ছুটি দিলে মনে পুণ্যের হাওয়া। কিন্তু পাপ ছুটি দিলে তো?

বুঁচকিকে দেখল। তবে কোনো সেরকম পাড়ায় না। দক্ষিণেশ্বরে। একদিন সন্ধ্যেবেলা। অন্ধকারে গঙ্গার ধারে ঝুঁকে বসে। পাশে একজন পুরুষ। বুঁচকিকে জড়িয়ে। বিশ্রীভাবে জড়িয়ে। মানুষ ভালোবাসলে ওভাবে জড়ায় না।

খোকনের পা এগোলো না। মন এগিয়ে গেলো। ফিরে এসে চড় মারল নিজের গালে। খোকন চলে এলো। রামকৃষ্ণদেবের ঘরে বসে বড়লোকেরা। ঢুকতে লজ্জা লাগে। ওরা চোখ বন্ধ করে ধ্যান করে। ধ্যান মানে কি? মা কালীর সামনে দাঁড়ালো। প্রণাম করল। প্রার্থনা করল। বুঁচকির জন্য, ওর বরের জন্য, ওর বাচ্চার জন্য প্রার্থনা করল। মনটা শান্তি লাগল। বাপুজি কেকের মত শান্তি।

গঙ্গার ধারে বসল। লোকটা কি বুঁচকিকে নিয়ে এইখানেই শোবে? নাকি ওর জায়গা আছে অন্য? আশ্চর্য, শরীরে কোনো তাপ জন্মালো না। মনের মধ্যে কান্না জন্মালো। যেন লাইনে শুয়ে

Sourav Bhattacharya

ধড়টাকে আলাদা করে দিলেই হয়। এত লজ্জা নিয়ে মানুষ বাঁচে কি করে? তবু বাঁচতে ইচ্ছা করে। ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছা করে। খোকন উঠল। পকেটে অনেক খুচরো। মন্দিরের বাইরে বসা সার দেওয়া ভিখারিদের একে একে দিল। মায়ের কাছে প্রার্থনা করল, ওরা বাঁচুক, সবাই বাঁচুক।

খোকনদা?

চমকে ফিরে তাকালো খোকন, বুঁচকি তার দিকে তাকিয়ে। আশেপাশে লাল টি-শার্ট পরা কালো লোকটা কই?

খোকন বোকার মত হাসল। বলল, তুই এখানে?

বুঁচকি বলল, মাঝে মাঝে আসি গো... আজ ছুটি কাজের তাই...

খোকন বলল, চল কচুরী খাবি? তোর কাছে আমার এমনিই ঋণ আছে চা আর কেকের...

বুঁচকি বলল, ছাড়ো তো... চলো কচুরী খাই...

পাশাপাশি বসল। বুঁচকির গা থেকে উগ্র সেন্টের গন্ধ। যেন পুরুষের ঘামের গন্ধও। খোকন পকেট থেকে টাকাটা বার করে দিয়ে বলল, এটা রাখ।

বুঁচকি বড় বড় চোখ করে বলল, না গো... হয়ে গেছে ওটা...

খোকনের ভুস করে কান্না পেয়ে গেল... যেন কানের কাছে বলে গেল কেউ, কি করে হল জানিস তো খোকন... খোকন বলল, তবু রাখ...আমি তোর দাদা না?

মন্দিরে আরতি হচ্ছে। ঠাকুরের ঘরের সামনে কারা গান গাইছে, 'খণ্ডন ভব বন্ধন'... এই সুরটা শুনলে ভালো লাগে... আরাম লাগে... মরতে ইচ্ছা করে না... সবাই বাঁচুক...খোকনের কচুরী কান্না ভিজে গলা দিয়ে নামছে। বুঁচকি কথা বলছে না। না বলুক। কিছু কথা নিঃশব্দেরাও বলুক। বুঁচকি তুই বাঁচ, তোর ছেলে-বর বাঁচুক। শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে পবিত্র কাজ জগতে কিছু নেই রে। শরীর তো ধুলেই পরিষ্কার। মন বাঁচুক জলের স্রোতের মত। সব ভেসে যাক। সব ভাসিয়ে নিয়ে যাক।

Gourav Bhattacharya

করবী

১

==

চেনা ফুলের গন্ধ। তবু ছেড়ে যেতে হবে। গন্ধের চেয়ে আপন কোনো স্মৃতি নেই। পোড়া উনুনের গন্ধ, ভিজে মাটির গন্ধ, মাথার তেলের গন্ধ, তেত্রিশটা বছর সঙ্গে কাটানো মানুষটার ঘামের গন্ধ, এই রেললাইনের গন্ধ... সব চেনা মৈত্রী রেড্ডি'র। বয়েস ষাটই হবে। স্পষ্ট মনে নেই।

ছোটো স্টেশান। ভোরের আলো অল্প অল্প কিশোরত্ব পাচ্ছে। ট্রেন দেরি আছে। কেউ ছাড়তে আসেনি। আসবেও না। মৈত্রী বাণপ্রস্থে যাচ্ছে। সংসারে সব আছে। কিন্তু মৈত্রী আর সংসারে থাকবে না। শেষ কয়েক বছর নিজেকে মাকড়সার মত লাগছিল। নিজের জালে নিজে আটকে গেছে যেন সে। মৈত্রী অরুণাচলমে যাচ্ছে। রমণ মহর্ষির আশ্রমে।

মৈত্রী'র বাবা রমণ মহর্ষির আশ্রমে যেতেন। মহর্ষিকে একবার দেখেছে মৈত্রী। তখন কত ছোটো সে। তবু চোখদুটো স্পষ্ট মনে আছে। সারা জীবন ধ্রুবতারার মত তার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

Sourav Bhattacharya

কয়েকবার সে চোখ মেঘে ঢাকেনি তা নয়। তবু আবার মেঘ কেটেছে। তার স্বামী কার্তিকেয় মারা যাওয়ার পর ভাইয়েরা এসেছিল তাকে নিয়ে যেতে। মৈত্রী যায়নি। কিসের জোরে যায়নি? ওই চোখদুটোর জোরে। একা বরের দোকান সামলেছে। বিজাওয়াড়া গিয়ে মাল এনেছে একা। অতবড় শহরে হারিয়ে যায়নি। আসলে মৈত্রী ছোটোবেলা থেকেই জানত সে হারিয়ে যাবে না। রমণ মহর্ষি'র চোখের আশ্রয় তার সঙ্গী। তার গুরুদেব। কোনো দীক্ষামন্ত্র নেই। ঈশ্বর সংস্কৃত ছাড়া কি অন্য ভাষা বোঝে না? পশুপাখির কথাও কি তিনি বোঝেন না? তবে আর সংস্কৃতে একটা শব্দমালা আবৃত্তি করে কি হবে অনর্থক কেবল। আসল তো নিজেকে খুঁজে নেওয়া।

নিজেকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে কি গভীর আনন্দ! নিজেই নিজের আনন্দ মৈত্রী। সারাদিন সে মনে মনে নিজেকে খুঁজেছে। কে সে? কার্তিকেয়'র সংসারে যেদিন বউ হয়ে ঢুকল, সেদিন সে বুঝেছিল একটা সুড়ঙ্গে ঢুকেছে। অনেক মানুষ নিয়ে বড় পরিবার। তার স্বামী বড়। আয়ের থেকে ব্যয় ছিল বেশি। সঙ্গে নানা অভিযোগ। অন্যায় অভিযোগ। হাতের কাছে মৈত্রী ছিল তাদের যাঁতার মত। সারাদিন পিষে ফেলার চেষ্টা হত। মৈত্রী আঘাত পেলে নিজেকে জিজ্ঞাসা করত, কে পেল আঘাত? মৈত্রী আনন্দের মুহূর্তে নিজেকে জিজ্ঞাসা করত, কে পেল আনন্দ? কার্তিকেয়'র অভিযোগ ছিল মৈত্রীর মধ্যে কেন উচ্ছ্বাস এত কম। কিন্তু কোনো অভিযোগের জায়গা কি সত্যিই রেখেছে মৈত্রী কার্তিকেয়'র জীবনে? তার দোকানের হিসাব থেকে তার শরীর মনের পরিচর্যায় কোনো ত্রুটি রেখেছে? রাখেনি। হয় তো সবটা সম্পূর্ণভাবে পারেনি। কিন্তু পেরেছে তো অনেকটাই। অথচ কার্তিকেয় কতটা তাকে জানত? জানত যে মৈত্রী কবিতা লেখে? জানত যে শেষরাতে সে ধ্যানে বসে? জানত যে স্নানের সময় সে কারোর প্রশ্নের উত্তর দিতে পছন্দ করে না? জানত যে সে খাওয়ার পর একটু মিষ্টি খেতে ভালোবাসে? জানত যে সে অরুণাচলমে রমণাশ্রমে যেতে চায়? না, কিচ্ছু জানত না। এটাই নিয়ম। মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাদের মর্জির উপর সে পুরুষেরা জানে। আসলে পুরুষেরা না, একটা সমাজ, মৈত্রী জানে। একটা সমাজ দীর্ঘদিন ধরে একভাবে চলে চলে অভ্যাস তৈরি করে দিয়েছে। মানুষ নিজে যে অভ্যাস গড়ে তুলেছে সচেতনভাবে তাকে সে ভাঙতে পারে। কিন্তু মানুষ নিজে যে অভ্যাসের মধ্যে জন্ম নিয়েছে, সে অভ্যাস তার অচেতনে কখন যে তাকে পেয়ে বসেছে সে বোঝে না। যখন বোঝে তখন তার থেকে বেরোতে ভয় পায়। কারণ সে অভ্যাসগুলোর সঙ্গে আত্মপরিচয় জড়িয়ে গেছে। তাদের ছাড়লে সে নিজে দাঁড়াবে কোথায়?

Sourav Bhattacharya

সাইড লোয়ার বার্থ মৈত্রী'র। ট্রেন ছাড়ল। সংসার ছাড়ল। স্টেশানটা পেরিয়ে যাচ্ছে। ওই যে রাস্তাটা বেঁকে একটা শিমূল গাছের পাশ দিয়ে শিব মন্দির হয়ে পুবের দিকে গেছে, ওদিকে চার কিলোমিটার হাঁটলেই তার বাড়ি। চড়া রোদ উঠে গেছে। এখন বাড়িতে থাকলে সে খবরের কাগজ নিয়ে বসত। নাতি দোকানে বসে এখন। নাতির মুখটা মনে বিঁধল ব্যথা হয়ে। মৈত্রী সামনের কুপের দিকে তাকালো। বড় পরিবার। ছ'টা সিট জুড়েই তারা। খাওয়া-দাওয়া করছে। গুজরাটি মনে হল। মৈত্রী ব্যথাটাকে বাড়তে দিতে চায় না। ফোনটা এখনও সুইচ অফ্ করা আছে। বুকটায় মোচড় দিচ্ছে। এত কেন? মৈত্রী'র চাওয়া পরোয়া না করেই চোখের কোল ভর্তি হয়ে এল জলে। মৈত্রী চোখটা বন্ধ করে পা টানটান করে নিজেকে জিজ্ঞাসা করল, কে কষ্ট পাচ্ছে, কে ফিরে যেতে চাইছে? কে দোলাচাল অনুভব করছে? কে সংশয়কে জানে? কে সমস্তকে জানে কিন্তু বিচার করে না? কে তার এত বড় জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তের সাক্ষী? কে তার ঘুমের মধ্যে থাকে জেগে? কে তার জাগার মধ্যে থাকে সব চিন্তা অনুভবের পিছনে নিঃশব্দে?

মৈত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ট্রেনের স্পিড অনেক। সব ছেড়ে যাচ্ছে পিছনে। সব ছেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কে সে অন্তরে সে সব ছেড়ে গেলেও যে ছেড়ে যায় না! সব ছেড়ে যাওয়ার যে সাক্ষী সে কে?

মৈত্রী দূরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে। তার সমস্ত ফেলে আসা জীবনটা মনের পর্দায় ছোটো ছোটো বিন্দু হয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। কোনো ছবি স্পষ্ট নয়, তবু তাদের অস্তিত্ব স্পষ্ট। এতবড় সংসারে, এ অসীম কালের স্রোতে একটা বিন্দু সে। তার স্মৃতি সে বিন্দুর মধ্যে আরেকটা বিন্দু। তার গোটা জীবনটা বাইরে তো কোথাও নেই আর, শুধু তার স্মৃতিতেই আটকে আছে সে। এত বড় সংসারে তার শোক-দুঃখ, পাওয়া-না পাওয়াই কি শেষ কথা? মন জাল তোল, জাল তোল, মৈত্রী নিজেকে বলল। সে কোনো স্মৃতিকে কাছে এনে হাতে নিয়ে দেখল না, আবার কোনো স্মৃতিকে দূরে ঠেলেও ফেলতে চাইল না। ওদের জীবনের সঙ্গে মৈত্রীর জীবনের আর কোনো যোগ নেই। ওদের দিকে তাকালেই ওরা তার মুখের দিকে তাকাবে। ওরা মিলিয়ে যাক।

Sourav Bhattacharya

২

===

আশ্রমে তার জন্য যে ঘর, সে ঘরটা খুব বড় না। মৈত্রী নিজেই চায়নি বড় ঘর। চিরকাল ছোটো ঘরে থেকে এসেছে, এই ভালো।

প্রথম চারদিন এক ঘোরে কাটল। মন্দিরে যায়, ধ্যানে বসে। বাকি সময়টা কিছুটা রান্নাঘরে যায়, কোনো কাজ থাকলে করে দেয়। বই পড়ে। সারাদিন মনের মধ্যে এক ঝুমঝুম শব্দ। আনন্দ নয়। এক উত্তেজনা।

ক্রমশ মনের মধ্যে একটা আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস যেন। ঠিক মন না। মনের গভীরে যে চেতনা, সে মনের থেকে মুখ ফিরিয়েছে যেন। মন ঘোলা হচ্ছে। দিনে দিনে আরো ঘোলা হচ্ছে। সেই চোখটাই বা কোথায়? এদিকে ওদিকে রমণ মহর্ষি'র ছবি তো আছে। সেই চোখ। কিন্তু সে চোখে কি যেন পড়তে পারছে না মৈত্রী। স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে না। নিজের ছোটোবেলার স্মৃতিকে জাগাতে চাইল। জাগল না। সংসারে ছোটো-বড় কত আঘাতের কথা মনে করল। মন অভিমানী হল। ঠোঁট ফোলালো। কিন্তু চিত্তে কোনো সাড়া দিল না। মাথার মধ্যে সারাদিন এক ঝুমঝুম শব্দ। আনন্দ নয়। বিষাদ নয়। বিভ্রান্তি।

হঠাৎ একদিন খুব বৃষ্টি শুরু হল। সকাল থেকে বৃষ্টি। মৈত্রী রমণ মহর্ষি'র ছবির সামনে বসে। দুটো চোখ তার দিকে তাকিয়ে।

মৈত্রী নিজেকে জিজ্ঞাসা করল, আমি এখানে কেন?

চোখ নীরব।

মৈত্রী বলল, আমি আশ্রমের জীবন চাই। সংসার আর ভালো লাগে না। আমি সবার থেকে একা হতে চাই। আমি একা।

চোখ নীরব।

Sourav Bhattacharya

মৈত্রী বলল, আমি এবারে আমার মত করে আনন্দ চাই। আমার একান্তের আনন্দ। আমার আত্মাকে আমি মুক্ত করে সেই মুক্তির আনন্দে নিমগ্ন থাকতে চাই।

চোখ নীরব।

মৈত্রী বাইরের দিকে তাকালো। তার বাড়ির সামনের করবীগাছটার কথা মনে পড়ছে। করবী ফুলের গন্ধ তাকে যেন ডাকল, আয়।

মৈত্রী বলল, কিন্তু কি যেন হচ্ছে না। আমি কি ভুল করলাম? আমি কি এখানে থাকার যোগ্য নই? আমি কি প্রস্তুত নই?

চোখ নীরব।

মৈত্রী বলল, তুমি কি চাও না তবে আমায়? তাই দূরত্ব?

চোখ বলল, দূর আর কাছে মনের ভাবনা। শরীরের মাপে। ঘুমের মধ্যে বোঝো তুমি কোথায়? কোন দেশে?

মৈত্রী বলল, না।

চোখ নীরব।

মৈত্রী বলল, তবে কি আমি আসতে চাইনি?

চোখ বলল, পালাতে চেয়েছ। তাই এত আয়োজন। যে আসে সে নিজের অজান্তেই এসে পড়ে। বিনা আয়োজনে।

আমি তবে ফিরে যাব? মৈত্রী জানা উত্তরের প্রশ্ন করল।

চোখ নীরব।

আসা যাওয়া তো বাইরের। ভিতরে কি আসা যাওয়া আছে? কার্তিকেয় কি সত্যিই কোথাও গেছে?

Sourav Bhattacharya

ট্রেন যখন স্টেশানে এলো তখন ভোরের মত বিকালের আলো। মৈত্রী হাঁটতে শুরু করল। ফোন সুইচ অন্ করা হয়নি। হাঁটতে হাঁটতে শিবমন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালো। মৈত্রীর এই প্রথম মনে হচ্ছে সে যেন প্রথম সবটা নিয়ে এসে দাঁড়ালো এই মূহুর্তে। তার ভবিষ্যতের কোনো অপেক্ষা নেই। যা আছে এখনই আছে। সব নিয়ে এই তো আছে। সুখ দুঃখ যেমন আছে, সে সবের সাক্ষী এক মহাচেতনাও এই মুহূর্তে তাকে ঘিরে আছে। নইলে এত বড় জীবনের ভার সে একা বয়ে বেড়াতে পারে? এত ক্ষমতা তার? শুধু কার্তিকেয় না, সে-ও এক চিন্তার অভ্যাসে নিজেকে অবশ করে ছেড়ে রেখেছিল। তাই এমন দূর আর কাছের, বাঁধন আর মুক্তির ইচ্ছা ফেঁদেছিল। নিজেকেই ঠকিয়েছে। কি পায়নি সে জীবনে? সব পেয়েছে। একটা গোটা জীবনকে সে পেয়েছে। আর কি চাই? কিচ্ছু না।

মৈত্রী বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। করবী গাছটা ফুলে ভর্তি। তার মনে হল সে যেন অরুণাচলমের মন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে। প্রতিটা ফুলে যেন সেই চোখের জ্যোতি। সেই চোখের করুণা। সেই চোখের আশ্রয়। কোথায় যেতে চেয়েছিল সে?

Sourav Bhattacharya

একটু রোদ

বৃদ্ধা সামনের দরজার দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছেন। একটু আগে আয়া অল্প একটু সেদ্ধভাত আর আর উচ্ছে আলুসেদ্ধ মাখা খাইয়ে গেছে। কুলকুচোটা ভালো হয়নি। দাঁতের ফাঁকে কয়েক টুকরো উচ্ছে আটকে এখনও। তিতো তিতো লাগছে জিভ ঠেকালে। সব মিলিয়ে আটটা দাঁত টিকে আছে এখন।

একতলা এটা। সোদপুর স্টেশান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্ব। ট্রেনের শব্দ রাতদিন। স্টেশানের অ্যানাউন্সমেন্টের শব্দ সারাটা দিন। আগে টাইমটেবিল মুখস্থ থাকত। এখন কানে আসে না তেমন কিছু। মনও গুটিয়ে গেছে অনেক। ভাঁজের পরতে পরতে স্মৃতির বাস।

শব্দ আছে কান নেই। খাবার সব আছে, স্বাদ নেই, হজমের শক্তি নেই। মাটি আছে, হাঁটবার, দাঁড়াবার শক্তি নেই। স্কুল টিচার ছিলেন। বিয়ে করেননি। দাদা বউদির সংসারেই কাটিয়ে দিলেন। এই একতলার ঘরই গোটা জীবন। বেড়াতে ভালোবাসতেন না কোনোদিন। মনের যাওয়া বলতে দক্ষিণেশ্বর আর পানিহাটির গৌরমন্দির। মাঝে মাঝে গঙ্গার ধার।

বৌদি মারা গেলেন গত বছর করোনায়। সবারই হয়েছিল। দাদা হাস্পাতাল থেকে ফিরে এলেন, একা। তার নিজেরও হয়েছিল, তবে হাস্পাতাল যেতে হয়নি।

Sourav Bhattacharya

আজ রাখী। দাদা নামলেন না। রেলে কাজ করতেন। রিট্যায়ার করেছেন কবে। দাদা বলেন, মনেই পড়ে না বুঝলি, যেন সে গতজন্মের কথা।

দরজার থেকে ঘরের মধ্যে রোদ এসে পড়েছে। পাখার আওয়াজ, রাস্তার হাজার একটা আওয়াজ, কাকের আওয়াজ, অল্প অল্প সব কানে আসছে। সারা পৃথিবী চলছে, শুধু তাদের দুজনের জীবনটা থমকে।

বিনু..... বিনু.....

বিনু রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল, আসছি।

রান্নাঘরটা একতলাতেই। বিনু এসে দাঁড়িয়ে বলল, কি?

দাদা আসতে পারবে না, না রে?

বিনু কথা বলে হাত পা নাড়িয়ে। বিনু হাত পা ছুঁড়ে বলল, কি বলো দিদা.... বাথরুমেই যেতে পারে না.... হাঁপিয়ে যায়... বেডপ্যান দিতে হয়.... সে এতগুলো সিঁড়ি বেয়ে নামবে?...

চিত্রলেখা একটু ইতস্তত করে বললেন, আজ রাখী....

বিনু বলল, আর রাখী... রাখো তো.... বেঁচে গেছো দুইজনে এই না ঢের....

বিনু চলে গেল। চিত্রলেখার বুকটা ধড়ফড় করছে। আশ্চে বছর কে থাকবে ঠিক আছে? না না, এ বছর পরাতেই হবে... বিনু... এই বিনু....

বিনু আবার এসে দাঁড়ালো... হাতে খুন্তী... বলি রাঁধতেও দেবে না.... খাবে না নাকি... কি হল? এখন আমি কিন্তু বাইরে যেতে পারব না রাখীটাখি কিনতে... বাজারে গেলেই এসে আবার স্নান করো.... রাখীটাখি স্যানিটাইজার করো.....

সব কথা হুড়মুড় করে বলল বিনু হাত পা ছুঁড়ে। চিত্রলেখা কতবার বলেছে, ওটা স্যানিটাইজার করা না রে, স্যানিটাইজ করা.... কে শোনে...

বিনু চলে যাচ্ছিল। চিত্রলেখা ডেকে বলল, একবার কাছে আয় না মা....

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

বিনু এলো মাটি কাঁপিয়ে। চিত্রলেখা একটা লাল সুতো হাতে দিয়ে বলল, এটা দাদার হাতে পরিয়ে দিয়ে বলিস, আজ রাখী... এ বছরটা যেন এইটাই পরে নেয়... সামনের বছর....

গলা ধরে এলো। বিনু কথা না বাড়িয়ে, 'আচ্ছা' বলে চলে গেল। বিনুর সিঁড়ি দিয়ে ওঠার আওয়াজটা কিছুক্ষণ শোনা গেল। মিলিয়ে গেল তারপর। দুটো শালিক পাখি এসেছে ঘরে। দরজার কাছে বসে খেলছে। অল্প অল্প হাঁটছে। দাঁড়াচ্ছে। মেঝেতে কিছু খুঁটে খাচ্ছে। চিত্রলেখার দিকে তাকাচ্ছে।

বিনু এলো, হাতে চামচে কিছু নিয়ে। চিত্রলেখার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো... বলল, দাদু তোমার জন্য কমপ্ল্যান পাঠালো... বলল, রাখী বেশ হয়েছে.... সামনের বছর এরকম রাখী পাঠালেই....

বিনুর চোখ বেয়ে জল পড়ল শাড়িতে। গলা বুজে গেল। কোনোরকমে নিজেকে সামলে বলল, তোমরা পারোও.... আমার তো কোনো ভাই নেই.... এসব বুঝিও না....

বলতে বলতে বিনু সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেলল... এক হাতে চিত্রলেখার মাথাটা অল্প তুলে বলল, হাঁ করো.... কেঁদো না... কেউ মরবে না তোমরা... কেউ না...

শালিক দুটো সারা ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনের পেয়ারা গাছের থেকে একটা কাঠবেড়ালি ক্রমাগত ডেকেই যাচ্ছে। পেয়ারা গাছের ছায়া মেঝেতে রোদের সঙ্গে মিশে লুকোচুরি খেলছে।

Sourav Bhattacharya

ভাগ্যিস

ttacharya

নিস্তারবাবু নাস্তিক মানুষ। কিন্তু মনে প্রাণে বাঙালি। শ্যামাসংগীত শুনলে, কীর্তন শুনলে চোখে জল আসে। মহালয়ায় বীরেন্দ্রবাবুর গলা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু এদিকে তিনি ডাকসাইটে নাস্তিক মানুষ। বিজ্ঞান সভাটভা করেন। তো এই দুর্গাপুজোর সময় মহা ফ্যাসাদে পড়েন। চাঁদাও দিতে হয়। পাড়া-সমাজের তাগিদে প্যাণ্ডেলেও বসতে হয়। এখন কি করেন?

নিস্তারবাবু এ দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রায় ষাট বছর বেঁচে। নিস্তারবাবুর স্ত্রী আবার ভীষণ ধার্মিক। ষোলোকলাদেবী হেন কোনো দেবদেবী নেই যা মানেন না, বা এমন কোনো অবতার নেই যাঁকে তিনি স্বীকার করেন না। সে আব্রাহাম থেকে বারের ঠাকুর সব। কিন্তু সেই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কোনো কোন্দল নেই। বেশ শান্তির সংসার। দ্বন্দ্ব শুধু নিস্তারবাবুর মনে।

ষষ্ঠীর দিন সকালে নিস্তারবাবু বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, এমন সময় ষোলোকলাদেবী এসে বললেন, এই নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি রেখে গেলুম, নতুন গেঞ্জি-জাঙিয়াও.... পরে নিওখন স্নান করে।

এইবার? নিস্তারবাবু ব্যাজার মুখে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। পাশেই খাটা রাখা নীল পাঞ্জাবির থেকে নতুন জামার গন্ধ আসছে। ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছে। মা বাপির কথা মনে পড়ছে। মনটা হঠাৎ মেঘলা দুপুরের মত ভারি হয়ে উঠল। ইচ্ছা করছে বাথরুমে গিয়ে একটু কাঁদেন, কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো আর ওঠা যাবে না। পাশের বাড়ির তিন্নি, ক্লাস থ্রিতে পড়ে, হোয়াটসঅ্যাপ করেছে এখনি আসছে নতুন জামা পরে দেখাতে। সেল্ফি তুলবে সে দাদু দিদার সঙ্গে। অগত্যা অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

কিছুক্ষণ পর পর দুবার এসে তাগাদা দিয়ে গেলেন ষোলোকলাদেবী। কিন্তু মেয়েটা....

নতুন জামাটা কোলে নিলেন। শুঁকলেন। নতুন জুতো কিনতে ইচ্ছা করছে। লজ্জাও লাগছে। কিন্তু ইচ্ছাও তো করছে। কি করেন?বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সেল্ফে রোজ পরা জুটোটা রাখা। জুতোটা এমন কিছু পুরোনো হয়নি, এই ফেব্রুয়ারিতেই তো কেনা। এবার? কিন্তু নতুন জুতোর গন্ধ পেতে ইচ্ছা করছে যে।

তিন্নি এলো। লাল একটা ফ্রক পরে। হাতে স্মার্টফোন। এসেই বলল, চলো... দিদা... ও দিদা... এদিকে এসো....

ষোলকলাদেবী দুটো লাড্ডু নিয়ে ঢুকলেন ঘরে। ছবি তোলা হল। নিস্তারবাবুর মন এদিকে উসখুস করছে নতুন জুতোর জন্য। তিনি তিন্নিকে বললেন, এ বাবা, তোর নতুন জুতো কই?

তিন্নি বলল, আরে ক'দিন আগেই কিনলাম তো... তাই মা-বাপি বলছে এখন না... আবার নতুন ক্লাসে...

নিস্তারবাবু বললেন, ধুস.. চ... কিনে আনি গে....

তিন্নি বলল, দাঁড়াও মাকে বলে আসি..

তিন্নির মা এসে কবার আপত্তি করলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

ষোলোকলাদেবীকেও নিয়ে নিস্তারবাবু চললেন টোটো করে জুতোর দোকান। রাস্তায় যত ঠাকুর পড়ে তিন্নি আর ষোলোকলাদেবী মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। নিস্তারবাবুর লজ্জা লাগে। বেমানান লাগে নিজেকে। তিন্নি দু'বার বকাও দিল। ঠাকুর রাগ করবেন শাসালোও। তাতেও কাজ হচ্ছে না দেখে হাতদুটো জড়ো করিয়ে নিস্তারবাবুর মাথায় ঠেকাতে ঠেকাতে বলল, তবে লালজুতোই ভালো।

দোকানে বেশ ভিড়। তবু তিনজনে ঠেসেঠুসে বসার জায়গা করে নেওয়া গেল। লালজুতো পছন্দ করতে আর তিন্নির কত সময় লাগবে, পাঁচ মিনিটেই হয়ে গেল। এবার তো উঠতে হবে। নিস্তারবাবুর ভীষণ লজ্জা লাগছে এবার। কি ছেলেমানুষী হয়ে গেল। কিন্তু উঠতে তো হবেই। বাচ্চা তো নন। উঠতে যাবেন... হঠাৎ দেখেন পাশে ষোলোকলাদেবী নেই। এত ভিড়ে কোথায় গেল?

তিন্নি বলল, দিদা কই দাদু?

নিস্তারবাবু কিছু বলতে যাবেন এমন সময় চেনা গলায় ডাক এলো... এদিকে একবার দেখে যাও তো...

কাঁচের মধ্যে সার দেওয়া চামড়ার চটি। ছেলেদের। ষোলোকলাদেবী বললেন, দেখো তো....

লজ্জায় কান গরম। ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ কিছুই বললেন না। বরং জোর করে ষোলোকলাদেবীর সকালে হাঁটতে যাওয়ার জন্যও একটা জুতো কিনে দোকান থেকে বেরোলেন। নিজেরটা তো কেনা হলই।

টোটোতে মুখোমুখি বসে দু’জন। তিন্নি দাদুর মোবাইল ঘাঁটছে।

কি কথা বলবেন? হঠাৎ কি হল, বললেন, এই সব পুজোটুজো মনের কুসংস্কার। আসলে জগতটা একটা বিজ্ঞানে চলছে....

তিন্নি বলল, আহা দাদু... দিদুনকে কেন বকছ?

ষোলোকলাদেবী বললেন, বকছে না সোনা... দাদু পড়া বলছে। আজ দাদুর পরীক্ষা ছিল। ধরা পড়ে গেছে।

তিন্নি মোবাইলটা থেকে চোখ তুলে বলল, কি ধরা পড়ে গেছে গো....

ষোলোকলাদেবী বললেন, পরে বলব।

বাড়ি এসে জুতোটা প্যাকেট থেকে বার করে প্রাণভরে শুঁকলেন। ষোলোকলা স্নানে গেছে। এখন আধঘন্টা। মায়ের কথা, বাপির কথা, দাদার কথা, দাদু-দিদা, ঠাকুর্দা, ঠাকুমা সবার কথা মনে পড়ল। পুজোয় সবার কথা মনে পড়ে। কেউ নেই এই মাটিতে। এইবার কান্না পাচ্ছে। কষ্টের কান্না ঠিক না। আবার আনন্দের কান্নাও নয়। আশ্বাসের কান্না। যেন কাঁদলে তারা শুনবে। তারা সবাই আছে। আছে, আছে, সব আছে। আছেকে বিশ্বাস করাই তো আস্তিক। ভালোবাসায় সব বাঁধা আছে। হঠাৎ "মা" বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। খাটে রাখা নতুন পাঞ্জাবি মানে মা। নতুন পায়জামা মানে মা। জুতোটাও মা।

পিঠে হাত।

ষোলোকলা দাঁড়িয়ে। পিছনে তিন্নি। দু'জনের চোখেই জল। তিন্নি কোলে উঠে বসল। বলল, আমি তোমায় নতুন জুতোটা দেখাতে এসেছিলাম... তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে... মায়ের জন্য? এই তো আমি...

ষোলোকলা মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বাচ্চাই থেকে গেলে...

ধরা গলা ষোলোকলার। নিস্তারবাবু ষোলোকলাদেবীর হাতটা বুকের উপর ধরে বললেন, সব আছে জানো... এখানে...

ষোলোকলাদেবীর চোখ থেকে বড় বড় দু'ফোঁটা জল পড়ল, তিনি মাথা নাড়লেন শুধু। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে নাড়া মানে তো "হ্যাঁ"। নিস্তারবাবুরও চোখ উপচে জল। তিন্নি মুছিয়ে বলল, কাঁদছ কেন,এই তো , আমি।

নিস্তারবাবু ষোলোকলাদেবীকে বললেন, তুমি স্নানে গিয়েছিলে না....

ষোলোকলাদেবী বললেন, শ্যাম্পুর পাতা নিতে বেরিয়েছিলাম....

নিস্তারবাবু অস্ফুটে বললেন, ভাগ্যিস....

Sourav

সে আসবে আবার বাড়ী চিনে

টোটোটা রেখে বাড়ি ঢুকল। স্নান করল। গরম জলে। এখনও অল্প অল্প ঠাণ্ডা। ভাত খেল। ডাল, আলুসেদ্ধ আর আধখানা পেঁয়াজ দিয়ে। তার পাশে বসে খেল তার বউ। চুড়ির আওয়াজ হল। গ্লাস রাখার আওয়াজ হল। চিবানোর আওয়াজ হল। কথা হল। অল্প অল্প হাসি হল।

খাওয়া শেষ। দু'জনে মুখ ধুলো বালতিতে রাখা জলে মগ ডুবিয়ে। দাঁতটা কনকন করল। বউ বলল, দু'দিন সরষের তেল আর নুন দিয়ে দাঁত মাজো।

বিছানায় এসে বসল। জানলা বন্ধ। ঘরের মধ্যে ঘরের গন্ধ। ঘরের গন্ধ আত্মীয়। অনেক সময় বাইরে কাটিয়ে, ঘরে ফেরার কান্না মনে বাড়ি এলে বোঝা যায়। সে গন্ধে বাবা, মায়ের গন্ধ মিশে।

ছ-বছরের ছেলে পাশের ঘরে ছিল। টিভি দেখছিল। বাবা মায়ের মধ্যে গিয়ে বসল, বলল, চলো বেড়াতে যাই।

এত রাতে? তার মা বলল। চোখদুটো তুলে কপালের দিকে।

বাবা বলল, বেশ, চলো সবাই যাই। রেডি হয়ে নাও।

বউ বলল, পাগল!

বউ উঠতে উঠতে বলল। সাজতে সাজতে বলল। গুনগুন করে গাইতে গাইতে বলল, পাগল!

সবাই রেডি। ছেলের গায়ে মোটা সোয়েটার ফুলহাতা। জিন্সের ফুলপ্যান্ট। গেলবার পুজোয় কেনা। মায়ের গায়ে শাল। লালের উপর সাদা পাখি। বাবার গায়ে জ্যাকেট। মায়ের গায়ে নীল শাড়ি। চোখে কাজল। ঠোঁটে লিপস্টিক। বাবার পায়ে বাদামী প্যান্ট। চোখে পরা নীচে আধখানা গোল চশমা। যা দিয়ে বাবা তার দাঁত মাজার পর দাঁত পরিষ্কার হয়েছে কিনা দেখে।

টোটোটাকে পিছনে নিয়ে রাস্তায় নামালো বাবা। মা ছেলে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে। জুতো শুঁকছে পাড়ার লালু। লেজ নাড়াচ্ছে, যেন হাতপাখা। ছেলে বলল, বাবা লালুকে নিই? বাবা বলল, অন্যপাড়ার কুকুরে বড্ড করবে ঝামেলা। তার চেয়ে থাক।

ছেলে তাকালো কুকুরের চোখের দিকে। কুকুর তাকিয়ে তার দিকে। কাজল পরানো চোখ। ছেলেকে সে বলল, আমায় কেউ বেড়াতে নিয়ে যায় না দেখ, চ না নিয়ে!

ছেলে ধরল জেদ। মা বলল, আচ্ছা। বাবা বলল, বেশ।

টোটো চলছে। বাবার পাশেই, ওই ছোট্টো সিটে বসেছে মা। পিছনে সে আর লালু। মা বাবার কানে আঙুল দিয়ে অ আ লিখছে। বাবার কাঁধে মাথা দিয়ে শুচ্ছে, যেন জ্বর। বাবাকে জড়িয়ে ধরছে কোমর বেড়ে। লালু দেখছে না। সে তার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে। ঝাঁকুনিতে মাঝে মাঝে ডাকছে, কেঁউ, কেঁউ। মানে সে বলছে আসলে, থ্যাংক ইউ... থ্যাংক ইউ।

ফাঁকা রাস্তা। বাবা এত ধীরে গাড়ি চালায় না। তবু চালাচ্ছে। বাবা আর মা খুব মজা করে। সে দেখেছে। সে ঘুমালে বাবা মায়ের উপর শুয়ে ট্রেন ট্রেন খেলে। তারা যখন পুরী যাচ্ছিল, যেমন ট্রেনের দুলুনি ছিল, বাবা তেমন দোলে। সে জেগে গেলেও ডাকে না কাউকে। কে যেন বলে ডাকতে নেই। বাবা মাকে চুমু খায় তখন। অন্যরকম চুমু। অন্যরকম আওয়াজ।

বেঁচে থাকার গল্প

টোটো এসে দাঁড়ালো ধানক্ষেতের মাঝে। বাবা নামল। মা নামল। লালু নামল। সে নামল। আর নামল এক আকাশ তারা। সবাই বলল, এসেছিস!

চারজনে বসে চুপ করে। রাস্তার উপর। গা ঘেঁষে ঘেঁষে। সে বসেছে মাঝখানে। লালু বসেছে পিছনে। বাবা মা মাঝে মাঝেই চটকে দিচ্ছে তাকে। চুমু খাচ্ছে।

সে বলল, বাবা, তুমি কি হতে চেয়েছিলে গো ছোটোবেলা? টোটো ড্রাইভার?

বাবা তাকালো আকাশে। তারারা বলল, মনে আছে?

ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি হতে চেয়েছিলে গো... বলো না আমায়!

মা তাকালো মাটির দিকে। শিশিরভেজা ধানের শীষ বলল, মনে আছে?

বাবা তাকালো মায়ের দিকে। মা তাকালো বাবার দিকে। দু'জনে হাসল। মুখের মধ্যে যেন গোটানো মশারির মত শান্তি, তবু ছড়ে যাওয়া হাঁটুর মত ব্যথা। তারপর বাবা তার গালে চুমু খেয়ে বলল, কি হতে চেয়েছিলাম? তোর বাবা। মা তার মাথায় চুমু খেয়ে বলল, তোর মা। কাল শ্যাম্পু করে দেব, খুব জট।

তারা ফিরবে। কিন্তু লালু কোথায়? এদিক ওদিক কত খুঁজল। কোথাও নেই। ছেলে কাঁদল। বাবা বলল, কাল দিনের বেলায় আসব আবার, আনব খুঁজে। মা বলল, কাঁদিস না, ও ঠিক আসবে বাড়ি চিনে।

তারা বাড়ি ফিরছে। মায়ের কোলে মাথা রেখে সে ঘুমাচ্ছে কেঁদে। গালের উপর কান্নার চটচটে শুকনো নদী। মা ভাবছে কি হারালো যেন। বাবা ভাবছে কি হারালো যেন! তারারা হাত নেড়ে বলল, কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। যা হারালো সে আবার আসবে বাড়ি চিনে। কিচ্ছু হারায় না। আবার আসিস।

তাকানো

tacharya

কুহেলি ফুচকাটা মুখে দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। ছেলেটা তাকিয়ে আছে।

কুহেলি ফুচকার স্বাদ পেল, নিল না। এভাবে নিজেকে একা একা ভালোবাসতে, নিজের খেয়াল রাখতে ইচ্ছা করে না। নিজের আবদার মিটিয়ে মিটিয়ে সময়ের জাল বুনে যাচ্ছে। গুটি কেটে বেরোবে কবে?

এবার জল ছাড়া দেবেন....

শুকনো ফুচকা। আলু মাখাটায় ঝাল আছে। চেনা মুখ। তাকাচ্ছে কেউ কেউ। কেউ কেউ হাসছে। কুহেলি এই নিয়ে ভাবে না। ভাবনাটা মিক্সি মেশিনের মত, যাই দেবে সেটারই ঘোল বানিয়ে ছাড়বে। অনেক কিছু নিয়েই আর ভাবে না। দুবেলা ভাতের জোগাড় হয়ে গেছে যখন বাকিটা নিয়ে আর ভেবে কি হবে? এই তো সামনের জুলাইতে একচল্লিশ ছোঁবে।

কুহেলি ফুচকার দাম মিটিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে বসল। সিগারেট ধরালো। তার গালে অনেক বসন্তের দাগ। পারমিতা বলে তার গালদুটো নাকি সিগারেট খেয়ে খেয়ে পুরুষদের মত হয়ে গেছে। রুক্ষ। খড়খড়ে।

======

বাবার খাবার দাও... আমি নিয়ে যাচ্ছি।

কেন মেজদি যাচ্ছে তো...

না না আমায় দাও.... মেজদি বাবাকে খাইয়ে আসে না.....

পাশের ঘর থেকে শব্দ এলো... ঢং।

বারো বছরের মেয়েটা, হাতে একটা ব্যাগ, ব্যাগের মধ্যে টিফিনবাক্সে ভাত আর তরকারি নিয়ে চলল। বাবা বালি তোলার কাজ করছে।

খেয়ে এয়েচিস মা?

না গো....

আমার সঙ্গে দুটো খা.....

না না... আমার লজ্জা লাগে... এত লোক.... আমি বরং মুড়ি বোঁদে খেয়ে নেব... পয়সা দিও....

নদীর ধারে বসে বাবা-মেয়ে। মেয়ে বাবার খাওয়া দেখছে। কি খাটে মানুষটা! তাকেই সব চাইতে বেশি ভালোবাসে। মেজদিকেও না, বড়দিকেও না অতটা।

জানো বাবা আমি না মেজদির গোবর চুরি করি...

কিভাবে রে?

আর মেজদি তো গরুর পোঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে... কে কখন হাগছে দৌড়াবে.... সে যেই দৌড় দেয় আমি এক খাবলা গোবর তুলে আমার ঝুড়িতে রেখে আবার খেলতে চলে যাই....

তাই তো মেজদি তোর সঙ্গে গোবর আনতে যেতে চায় না..., শিব গায়েন হাসতে হাসতে বলল। প্রশ্রয়ের হাসি। এই প্রশ্রয়টুকু না পেলে বাঁচে কি করে মেয়েটা? এই প্রশ্রয় ফুলের পাপড়ির মত। আড়াল করে, সুন্দর করে।

আমার সঙ্গে যাবে না তো কে নিয়ে যাবে ওকে..... ভীতুর ডিম একটা.... আমরা সেই গোবরে ঢিল পুরে খেলি না.... সেটাও খেলবে না.... বলবে ছেলেদের সঙ্গে অত কি! আচ্ছা বাবা, ছেলেরা কি খারাপ?

শিব গায়েন নদীতে হাত ধুতে ধুতে হাসে। এই মেয়ে যদি একবার কথা বলতে শুরু করে....

না মা, ছেলেরা খারাপ কেন হবে... তবে বড় হচ্ছ বলে দিদি....

জানো মা-ও ধরে ফেলেছে.... সেদিন তো একা গেছি গোবর আনতে.... আমার তো খেলায় মন.... এইটুকু গোবর আনলেই তো মা মার দেবে.... তখন কি করেছি, দুটো ইঁট রেখে ঝুড়িতে তার উপর গোবর ফেলে এনেছি...

শিব গায়েন বিড়ি ধরাতে ধরাতে হেসে ফেলল... এ ঘটনা শুনেছে কাল রাতেই,

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল মেয়ে। বলল, আমার ওই দুটো ইঁটেই মাথা ব্যথা হয়ে গেল। তোমার খুব লাগে না গো....

বলতে বলতে মেয়ের চোখ উপচে জল এলো....

শিব মেয়েকে তাড়াতাড়ি কোলে নিয়ে বলল, আজ আমরা একসঙ্গে বাজার করে বাড়ি যাব... বাবাদের মাথাটা ভগবান শক্ত করে বানিয়েছে... এই হাত দিয়ে দ্যাখ... দ্যাখ.... ইস কি নরম হাত... তাই তোর এত লেগেছে.....

=======

কুহেলি হাতের দিকে তাকালো। পিজবোর্ড এর মত খসখসে। ছেলেটার বয়েস কত হবে? তেইশ কি চব্বিশ। বড় বেশি কৌতুহল এখনকার ছেলেমেয়েদের। তাকে দেখতে চাইবে। আলো জ্বালা থাকবে ঘরে। জানলা দরজা বন্ধ। বাইরে দিনের আলো। নানা মানুষের কথা। গাড়ির আওয়াজ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। হামলে চুমু খাবে। কামড়াকামড়ি করবে। যেমন দেখে ওইসব সাইটগুলোতে। ইন্টারনেটটাই এখন রেণ্ডিবাজার হয়েছে। বড় জ্বালায় এই বয়সের ছেলেগুলো। যতটা না খিদে, তার চাইতে বেশি কৌতুহল। এ কি কাস্টমার ছিল কখনও? কে জানে বাবা, মনে পড়ছে না।

বাসে উঠল। বসার জায়গা পেল। ছেলেটাও উঠল।

অস্বস্তি লাগছে। যে বন্ধঘরটা থেকে আজকে ছুটি নিয়েছে সেটার স্মৃতি আজকে ভালো লাগছে না। কি করবে, নেবে যাবে?

======

বাবা ঠাকুরের দশটা হাত কেন? ঠাকুর তোমার সঙ্গে বালি তুলতে এলে কত ভালো হত বলো?

শিব গায়েন মেয়েকে কোলে নিয়ে বলল, চুপ চুপ....

এক কালে জমিদার ছিল এরা। এ বাড়িতে এখনও অষ্টমী আর নবমী গরীব মানুষদের খাওয়ায়। শিব গায়েন মেয়েটাকে নিয়ে বসার অপেক্ষা করছে।

বাবা তুমি নতুন ধুতিটা পরে আসতে পারতে তো...

নতুন ধুতি পরে এলে মানুষের তাকানো বদলে যায় রে। বড় হলে বুঝবি।

=======

মানুষের তাকানো। কত যে তার মানে! গোটা জীবন কেটে যায় তার রকম বুঝতে। মানুষ শুধু নিজের তাকানোটা বুঝতে পারে না। আয়নায় যে তাকায়, সে কে?

লালবাবা কলেজ চলে গেল। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো কুহেলি। নামবে এইবার।

ছেলেটাও নামল। তার থেকে কিছুটা দূরে দূরে হাঁটছে।

কুহেলি মায়ের মন্দিরে, ঠাকুরের মন্দিরে প্রণাম করে মন্দিরের পাশের মাঠে, ঘাসে এসে বসল। ছেলেটা আসুক। কত খারাপ কথা আর বলবে। ঠাকুর আছেন। বেলুড় মঠে তাকে যে প্রথম এনেছিল, সে ঠাকুরের কাছে এখন। বড় আগে চলে গেল। নাকটা টাটিয়ে উঠল। বড় দুঃখী মানুষটা ছিল। সোহাগ চাইত। কিন্তু দিতে পারত না। রোগে সে শক্তি গিয়েছিল। বিয়ে করেনি তাই। কুহেলিকে দেখে তার মনে হয়েছিল এ বুঝবে, করুণা করবে না। সংসারে কেউ তাকে ভরসা করেছে, এই কি কম!

কুহেলি কোনোদিন করুণা করেনি। ভালোবেসেছিল। এক একদিন মনে হয়েছে সে তো মা! তাকে কোলে শুইয়ে আদর করেছে। তার নগ্ন শরীরের সব লজ্জাকে হাতের স্পর্শ দিয়ে শুদ্ধ করেছে। লজ্জা নিয়ে বাঁচা ভীষণ লজ্জার।

একটু বসব?

আপনি কুহেলি তো.....

ছেলেটা বসল। একটু নার্ভাস। এরকম হয়। অনেক দেখেছে।

হ্যাঁ, বলুন।

বলছিলাম, একটা ইন্টারভিউ দেবেন... মানে সাক্ষাৎকার....

ইন্টারভিউ মানে আমি বুঝি.... কিন্তু কেন?

আমরা সমাজে সব স্তরের মানুষদের নিয়ে কাজ করছি। তাই এইবারে....

আর কাকে কাকে বলেছেন.....

আপাতত কাউকে না.... আপনাকে দিয়েই শুরু.... আপনার সাজেশান নিয়ে অন্যদের যোগাযোগ করব....

চা খাবেন?

হ্যাঁ, মানে, চলুন...

======

কুহেলির সাক্ষাৎকারটা ছাপা হয়নি। কেন হয়নি জানবার ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু জেনে ওঠা হয়নি। পত্রিকাটা কিনেছিল। বড় রগরগে গল্প সব। রমেশদা বলত, যোনিবৃত্তান্ত.... দালাল ছিল। বলত, কলকাতায় কিছু পণ্ডিত আছে তারা রাতদিন যোনিবৃত্তান্ত লেখে।

ছেলেটার সঙ্গে কয়েক বছর পর বইমেলায় দেখা হয়েছিল। কুহেলি চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। তখন সে ছেলে কই, লোক, পাশে সিঁদুর পরা মেয়েমানুষ ছিল না। তার বউ।

কুহেলি নিজেকে এই জায়গাটায় বোঝে না। এই মাথা নীচুটা কি লজ্জায়, নাকি ক্ষোভে, না অভিমানে?

======

বাবা, চিনতে পারছ?

বেঁচে থাকার গল্প

শিব গায়েন সরকারি হাস্পাতালের বেডে শুয়ে। মেয়ে কলকাতায় এনেছে, চিকিৎসার জন্য।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে।

উনি নেই আর.... আপনাকে বলা হল না....

আমি বিশ্বাস করি না....

তবে বিধান রায়কে ডাকতে হবে নাকি?

কুহেলি ওদের হাসি শুনেছিল। অনুভব হয়নি। কিছু না বলে চলে যাবে মানুষটা? বাবার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কুহেলি। শেষ তিনদিনই বাবা তাকে চিনতে পারেনি। তাকিয়ে থাকত শুধু।

কুহেলিকে চেনার মানুষ সেইদিন থেকে নেই আর। বাবা-ই বুঝিয়ে গেলেন, আর তোকে কেউ চিনবে না রে টরটরি.... এই আমার চোখটা মনে রাখিস.... এইভাবে সব শূন্য হয়ে যাবে... তুইও....

======

কুহেলি বেলুড় মঠের মন্দিরের পাশে বসে আছে। অদৃশ্য ঠাকুর স্পষ্ট হয়ে বসে আছে তার পাশে। নইলে বুকে এত ভরসা জোগায় কিসে? ঠাকুর বলছেন, আমার উপর বিশ্বাস রাখ কুহেলি হারিয়ে যাবি না তবে....

কুহেলির চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। প্রার্থনায় বসবে এবার। প্রার্থনায় একটা শব্দ আছে "সমদরশন"... ওই চোখের কাছে সব সমান.... এমন দৃষ্টিও আছে, শ্রী শ্রী মায়ের মত এমন তাকানোও আছে.... নইলে সব কবে ছাই হয়ে যেত... মানুষ শুধু নষ্ট করে, রাখে তো ঠাকুর.....

কুহেলি সবার জন্য প্রার্থনা করে। প্রার্থনা যজ্ঞ। তার সব পাপতাপ মিলিয়ে যায়। ঠাকুর বলেন, পাপ কিরে কুহেলি.... আমার দিকে তাকা... তাকা.... দেখ সব ধুয়ে যাচ্ছে।

চোখের জলে ভাসে কুহেলি। সব ধুয়ে।

Sourav Bhattacharya

দশটাকা

পুজোর ডালা আটকে দিল পুরোহিত। বলল, প্রণামী না দিলে হবে না।

মাথাটা গরম হল। পঞ্চাশ টাকার ডালা কিনল যে!

দশটাকা নিয়ে ডালা ছাড়িয়ে বাইরে এলো। টোটোর একপাশে রেখে বসল। ভাড়ার অপেক্ষায়। বাড়ির দিকে একটা ভাড়া পেলে শুধু শুধু যাওয়া হয় না আর।

আসে না কেউ। প্রার্থনা করল। একজন অন্তত আসুক। অর্ধেক রাস্তা অন্তত যাক।

তাও কেউ এলো না। খিদে পাচ্ছে। দুপুর একটা তো হবে!

পুরোহিত মন্দির বন্ধ করে বাইরে এলো। এসেই বলল, টোটো.... বকুলতলার মোড়.... যাবে?

যাব তো। ভাড়া দশ টাকা।

টোটো স্টার্ট দিল। চালক বলল, ওদিকেই থাকেন?

পুরোহিত বলল, না রে ভাই... মেয়েটার পড়ার মাষ্টার জোগাড় করে ঘরে না ঢুকলে আজ ভাত জুটবে না... পড়ানোর যা খরচ... বিয়ে করেছ?বাচ্চা আছে?

আছে তো.... এইটে পড়ে... সত্যিই যা খরচ....

পুরোহিত বলছে, আমাদের সময় খাতার এত দাম ছিল?! কি দাম গো... মেয়ে বেশি অঙ্ক করলে ভয় লাগে... মন্দিরে আর ক'টা টাকা দেয়?

কথা বলতে বলতে বকুলতলা এসে গেল।

পুরোহিত নেমে দশ টাকার একটা নোট বার করে হাতে দিয়ে বলল, নাও... খাওয়াদাওয়া হয়েছে? বাড়ি যাও এবার।

চালক পাঁচ টাকার একটা কয়েন এগিয়ে দিয়ে বলল, আসুন...

পুরোহিত বলল, দশটাকা বললে না?

চালক বলল, না না... পাঁচ টাকা তো....

পুরোহিত হাসল। বলল, মাথার ঠিক থাকে না গো.... কি বলেছ আর কি শুনেছি..... এসো... ভালো থেকো...

চালক স্টার্ট দিয়ে গাড়িতে অস্ফুটে বলল, আপনিও।

দুঃখ থেকে ত্রাণ

দুঃখ থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য কত উপায় মানুষটা করল। কোনোটা কাজে এলো না। তারপর দুঃখ পেতে পেতে একদিন যখন তার দুঃখের ভয়টা চলে গেল, তার মনে হল যেন কদ্দিনের না কাচা কম্বল তার গা থেকে খসে গেল। তখন তার নিজের আগেকার চেষ্টাগুলো মনে পড়ে হাসি পেল, নিজেকে কত নির্বোধ মনে হল। সে খুব হাসল ক'দিন ধরে। লাগাতার হাসল।

তারপর নদীর ধারে, সব চাইতে বিপজ্জনক ভাবে ঝুলে থাকা যে পাথরটা, তার উপর গিয়ে বসল। তার পায়ের নীচ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে, মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে, তার পিছনে জঙ্গল থেকে নানা ফুলের গন্ধ আসছে। সে সব দেখে আর হাত তুলে বলে, আরে বাহ্, কেয়া বাত... কি দারুণ, দারুণ।

সবাই যারা নদীর ধারে আসে, কেউ নাইতে, কেউ কাপড় কাচতে, কেউ ওপারে যেতে, তারা বলে আরে ও পাথরটা থেকে নেমে এসো, ওটা যে কোনো মুহূর্তে জলে পড়ে যাবে, তুমি তলিয়ে যাবে নদীতে।

সে হাসে। বলে, আরে ভাই, এটাই তো ভয়, যে কোনো মুহূর্তে তলিয়ে যাওয়ার। যাবে যাক।

Sourav Bhattacharya

এই বলে সে আবার বিভোর হয় আনন্দে।

একদিন এক যুবক সন্ন্যাসী এলো তার কাছে। তখন অনেক রাত। সদ্য পূর্ণিমা গেছে। তাও চাঁদের গায়ে টোল পড়েনি এখনও। সে এসে একটু দূর থেকে বলল, তুমি কি মন্ত্র সাধনা করে এই অবস্থায় এলে গো?

লোকটা বলল, কোনো মন্ত্র নয় তো, এমনি এমনিই।

সন্ন্যাসী বলল, তোমার গুরুর নিশ্চিয় বারণ আছে বলার। তাই বলছ না, তাই না?

সে বলল, ধুর পাগল, আমার আবার গুরুকে? আমিই তো আমার গুরু।

সন্ন্যাসী বলল, তবে? তোমার মধ্যে এত আনন্দ এলো কি করে?

সে বলল, তোমারও হবে। দুঃখ পাওয়ার ভয়টা কেটে গেলেই আনন্দের ফোয়ারা খুলে যাবে।

সন্ন্যাসী বলল, কবে হবে আমার? কি করে হবে?

লোকটা বলল, প্রচুর দুঃখ পেতে পেতে হবে। ব্যস, এই হল সাধন।

সন্ন্যাসী বিমর্ষ হয়ে চলে গেল। লোকটা পাথরে শুয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, জ্বল, জ্বল। নিভিসনি। নিভলেই সব আঁধার।

Sourav Bhattacharya

কোন অন্তিম স্টেশান হয় না

Sourav Bhattacharya

এক কাপ চা খাওয়াবেন?

হ্যাঁ, খাওয়ানো তো যেতেই পারে, কিন্তু একি আবদার?

রঞ্জন খবরের কাগজ থেকে মুখটা তুলে পাশে বসা লোকটার দিকে ভালো করে তাকালো। রোগাটে মুখের গড়ন। কালো। সবুজ জামা গায়ে আর একটা নীল-কালো চেক চেক লুঙ্গি পরে, চোখ দুটো উদাস, তার দিকে তাকিয়ে...

সে আবার বলল, আপনি চেন্নাই মেল ধরবেন তো? দেরি আছে, আপনি কি এই খড়গপুরেই থাকেন? আমায় একটু চা খাওয়ান না... আমি ভিখারি নই... আমার টাকার ব্যাগটা পুলিশে কেড়ে নিয়েছে... দেবে না আর... এদিকে আমার এখন একটু চা না হলে মাথাটা টিসটিস করা শুরু করবে... দিন না প্লিজ...

রঞ্জন উঠল... লোকটাকে চেনা মনে হচ্ছে...খুব স্পষ্টভাবে মনে পড়ছে না... মনের মধ্যে একটা ঘসা কাঁচ আছে... সেই কাঁচের আড়ালে মাঝে মাঝেই এর ওর মুখ ভেসে আসে... রঞ্জন এই তিপ্পান্ন বছর বয়সে বুঝেছে মানুষ নিজেকে কোনোদিন স্পষ্ট বোঝে না... মানুষ আসলেই কোনোদিন

বড় হয় না.... ফস করে কখন নিজের অজান্তেই আবার একটা কাঁচা কাজ করে ফেলে সব ঘেঁটে দেয়....

চা নিল দু'কাপ। লোকটা হাত বাড়িয়ে নিল, একটু হাসল, বলল বসুন...

কায়দা দেখো, যেন শালা নিজের বসার ঘরে বসতে বলছে... খড়গপুর স্টেশান না...

রঞ্জন বসল। লোকটা চায়ে একটা সশব্দ চুমুক দিয়ে বলল, আমার নাম সুজন সামন্ত। আমার বাড়ি এদিকে নয়, কৃষ্ণনগর। এদিকে কেউ চেনে না আমায়, ক'দিন পর চিনবে।

ক'দিন পর চিনবে মানে?

রঞ্জন খবরের কাগজটা পাশে রেখে, চায়ে অল্প একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল। লোকটার গলা শুনে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক। কথা শুনতে ইচ্ছা করছে। বলুক, এমনিতেই ট্রেন লেট, আসতে এখনও দেড় ঘন্টা।

সুজন বলল, আমার কৃষ্ণনগরের ভিতরের দিকে একটা গ্রামে মিষ্টির দোকান। আপনি গেছেন ওদিকে কখনও?

রঞ্জন বলল, না। আমি ওই লাইনে শ্যামনগরের বেশি আর যাইনি। মাকে নিয়ে কালীবাড়ি গিয়েছিলাম। শ্যামনগর কালীবাড়ি।

হ্যাঁ, বুঝেছি। কি আশ্চর্য না? কালীমন্দির বললেন না, বললেন কালীবাড়ি...

হ্যাঁ, তাই তো বলে সবাই... মানে আমার মাসিরা ওখানে থাকতেন... ওদের মুখেই শুনেছি...

না না, ভুল বলেননি তো... ঠিকই বলেছেন। কালীবাড়িই তো বলে। কথাটা কি দারুণ না? বাড়ি... তা আমারও বাড়ি ছিল জানেন... মানে এখনও আছে... বিয়ে হয়েছিল তা চার বছর হবে... রাণাঘাটের মেয়ে... পারমিতা... মাধ্যমিক পাশ... আমি উচ্চমাধ্যমিক ফেল...দেখতে শুনতে ভালো... মানে আমার চাইতে ঢের সুন্দর বুঝলেন... গায়ের রঙ অল্প চাপা হলে কি হবে... কিন্তু বেশ... আপনি হয় তো ভাবছেন আপনাকে এ সব বলা কেন? আসলে আমার ঘরে থাকতে অসহ্য লাগছিল... এত চীৎকার করছে না ওরা...

Sourav Bhattacharya

কারা?

সে পরে বলছি...

রঞ্জনের লোকটাকে ভীষণ চেনা লাগছে, বিশেষ করে পাশ ফিরে যখন কথা বলছে।

লোকটা বলল, এই আপনার হাতের জিনিসটাই আমার সংসার ভাঙল জানেন...

রঞ্জন নিজের ফোনটার দিকে তাকালো।

লোকটা বলল, হ্যাঁ এইটাই... ওর একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ছিল... সারাদিন ও ওই মোবাইলেই ডুবে থাকত... আমি ভাবতাম বুঝি প্রেমট্রেম করে... দিন যত যায় নেশা তত বাড়ে ওর... আমার মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হয়... কিন্তু সন্দেহ করতে কি খারাপ লাগে না? যাকে ভালোবাসেন তাকে সন্দেহ করতে কি বুকটা পুড়ে যায় না? অথচ দেখুন যাকে দেখতে পারি না তাকে সন্দেহ করতে কি ভালো লাগে, যত সন্দেহের কারণ পাওয়া যায় মনে তত আনন্দ... তাই না? তা আমিও একটা অ্যাকাউন্ট খুললাম। মাসের পর মাস ফাঁদ পেতে বসে থাকি... কই, কিছুই তো নেই...

রঞ্জন বলল, থাক না, এসব আপনার পারিবারিক কথা... তা ছাড়া এই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেমের গল্পটা এত পুরোনো আর একঘেয়ে হয়ে গেছে না, ভালো লাগে না শুনতে আর...

না ঠিক আমি বলতে চাইছি না জানেন। এটা তো আপনি বুঝেই গেছেন আমার বউয়ের উপর আমার ক্ষোভ আছে... কিন্তু তা না... আমি আসলে... দাঁড়ান ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না... আসলে আমি যেটা বলতে চাইছি... আপনি আমায় নার্ভাস করে দেবেন না, একটু শুনবেন প্লিজ, আমার মাথায় কিছু ভাবনা ঘুরে বেড়াচ্ছে... আমি সেগুলোই ছাড়াতে চাই...

রঞ্জন বলল, বেশ বলুন... চা তো শেষ, আরেক কাপ আনব?

না না উঠবেন না, আমার ভাবার রেশটা কেটে যাবে.... বসুন প্লিজ... চাইলে আপনি অন্যদিকে তাকাতে পারেন... ফোন ঘাঁটতেও পারেন... আপনাকে কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব না আমি... তবু আমার কথায় যদি আপনার মনে হয় কোথাও ভুল... মানে আপনার অভিজ্ঞতা বলে ভুল, তবে আমায় থামাবেন...

Sourav Bhattacharya

রঞ্জন বলল, বেশ বলুন...

দেখুন, ও আমায় ঠকাচ্ছিল ইনস্টাগ্রামে...কি করে জানলাম সে গল্পে আর যাচ্ছি না... সে ছেলেটার বাড়ি এখানে... মানে এই খড়গপুরে...

এই দাঁড়ান, আপনি তাকে খুনটুন করে ফেলেছেন নাকি?

আরে না দাদা... আসলে কথা হচ্ছে আমি ভেবে পেলাম না, পারমিতা আমায় ঠকালো কেন? আমি তো কোনো অভাব রাখিনি... না আমার মধ্যে কোনো রোগের বালাই আছে...সবই আমার দিক থেকে তো ঠিকই চলছিল...তবে কি হল বলুন তো?

দেখুন এ সব কেউ বলতে পারে না... এ হয়ে যায়...

আচ্ছা, আমিই বা কেন জেদ ধরে থাকলাম বলুন তো... মানে আমি তো জেনেছি বছর খানেক হল, আমি কেন ছেড়ে দিলাম না ওকে... ওকে তো আমি ভালোবাসি, ভালোবাসা মানে তো খাঁচায় পুরে টিয়াকে লঙ্কা খাওয়ানো না বলুন... এ তো মানুষ... তাও আমি ছেড়ে দিলাম না কেন বলুন তো? আপনি হয় তো ভাববেন, এ গ্রামের মানুষ, জটিল মনস্তত্ত্ব বুঝবে না... কিন্তু এ ধারণা আপনাদের ভুল জানেন তো... গ্রামের লোকও ভাবতে জানে... আপনি আমার ভাবনার ভুলটা ধরিয়ে দেবেন...

রঞ্জন সঙ্কুচিত হয়ে বলল, আরে না না...আমি ওসব ভাবছি না... বরং আপনার আত্মবিশ্লেষণের ক্ষমতা আমার বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে বলতে পারেন...

হ্যাঁ, কথাটা তাই, আত্মবিশ্লেষণ... আমার বুকটা পুড়ে যেতে লাগল জানেন... কেন ও আমাকে ঠকাচ্ছে... আমি মুখে কিছু বললাম না, সত্যি বলতে কোনোদিন বলিনি... গত পরশু যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি তখনও বলিনি... বললাম, কলকাতায় কাজে যাচ্ছি, ফিরতে দু'দিন লাগবে...

কেন এলেন এখানে?

কারণটা খুঁজতে। ওর সঙ্গে কথা বলে দেখতে কি আছে ওর মধ্যে। কিন্তু তার চাইতে বেশি আমার যেটা মনে হচ্ছে, আমি কেন আর পাঁচটা মানুষের মত ব্যবহার করছি। আমি তো বরাবরই

Sourav Bhattacharya

মানুষের স্বাধীনতা নিয়ে ভেবেছি। ওর যদি আমাকে ভালো না লাগে তবে নিশ্চয়ই ও আমাকে সরাসরি বলতে পারত, কেন লুকিয়ে... আচ্ছা ও কি একদিন পালিয়ে যেত?

দেখুন এ সব কথা কেউ বলতে পারে না...আর তাছাড়া আপনিই বা এত ভাবছেন কেন? সরাসরি ওনাকে জিজ্ঞাসাই করে দেখুন না...

না, থাক। বরং ও পালিয়ে গেলেই আমি শান্তি পেতাম। আমি মুখোমুখি হতে চাই না। আমার নিজেকে নিয়ে ভয়। আমি যদি নিজেকে সামলাতে না পারি?

রঞ্জন বলল, দেখুন, আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সম্পর্ক একটা খুব জটিল ব্যাপার। আর এই ধরণের সম্পর্ক তো আরো। আমার প্রায় দুই-তিনেক বন্ধু প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা করেছে, কেউ কেউ পুরো জীবনটা হেরে বসে আছে... আমারও ব্রেক আপের অভিজ্ঞতা আছে... আমি মুভ অন করে গেছি... বাই দ্য ওয়ে, আমি ব্যাচেলার...আমার কোনো সম্পর্কে বিশ্বাস নেই... তাই ঠিক এই বিয়েটিয়ে আমার দ্বারা হয়নি...

সম্পর্কে বিশ্বাস নেই মানে?

মানে আমি কোনো কমিটমেন্ট জড়ানো সম্পর্কে আস্থা রাখতে পারি না আর... ভাসা ভাসা সম্পর্কই ভালো... লেস পেইনফুল...

আপনি নিরাশাবাদী...

জানি না, ভেবে দেখিনি, তবে হতে পারি... ভালোবাসার মেমরিগুলো ভীষণ সমস্যার কখন হয় জানেন? যখন আপনি ওগুলো আবার জীবন্ত করতে চান... আই মিন রিপিট করতে চান... আমার মনে হয় ডিজ্যায়ার হল মেমরির আবার জীবন্ত হওয়ার ইচ্ছা... আমি জানি না আপনি রিলেট করতে পারছেন কিনা... মানে আমার বাংলা ভোকাবুলারি খুব কাঁচা...

আমি বুঝেছি। আপনি বলতে চাইছেন গত স্মৃতিগুলোকে আবার ফিরে পেতে চাওয়ার ইচ্ছাকে বাসনা বলে, তাই কষ্ট দেয়... আসলে আমার ইংরাজিটা ভালো ছিল... ওইতেই অনার্স করব ভেবেছিলাম, কিন্তু সায়েন্স নিয়েই যত গোলমাল হল...

Sourav Bhattacharya

হ্যাঁ, আপনি আপনার স্ত্রী'র সঙ্গে কাটানো স্মৃতিগুলোকে যতক্ষণ না শুধু স্মৃতি হিসাবে দেখছেন ততক্ষণ ওরা আপনাকে কষ্ট দেবে...

ঠিক... জানি না, হতেও পারে... আচ্ছা, আমায় ডাকছে, আমি আসছি বুঝলেন... হয় তো আবার দেখা হতে পারে...

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করতে গেল, "কে ডাকছে", কিন্তু তার আগেই সে দৌড়ে চলে গেল। ট্রেন দেরি আছে। রঞ্জন আবার খবরের কাগজটা খুলল। খুলতেই পিঠের নীচ থেকে উপর একটা ঠাণ্ডা স্রোত বেয়ে গেল।

একটা ছবি। পাশ থেকে তোলা। আনক্লেইমড, আন-আইডেন্টিফায়েড বডি, খড়গপুর রেলগেটের কাছে পাওয়া গেছে...এতো সুজন সামন্ত!

ট্রেন এলো। এসি টু টায়ার, সাইড আপার বার্থ।

রঞ্জন শুলো। নীল আলো কামরা জুড়ে। ঘুম আসছে না। চোখটা বন্ধ করে শুয়ে। হঠাৎ পায়ের কাছে কিছু ঠেকতেই চোখ খুলে তাকালো, সুজন বসে। আবছা আলোয় বেশ বোঝা যাচ্ছে। পা-দুটো ঝুলিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, পারমিতার ফোন নাম্বারটা লিখুন, ওকে জানিয়ে দেবেন প্লিজ, ছেলেটা ভালো নয়... ও এরকম অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে...

রঞ্জন বলল, আমায় বিশ্বাস করবে কেন সে?

সুজন বলল, ওকে বলবেন, ওর ডানদিকের থাইয়ে একটা লাল তিল আছে... সেটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না... অবশ্য রাকেশ জানে কিনা জানি না...

রঞ্জন বলল, এ কথা আমি বলতে পারব না, এ অসভ্যতা।

বেশ, তবে ওর পাসওয়ার্ডটা লিখুন, ফেসবুকের...

না না, একি করছেন!...

নীচের থেকে একজন ভদ্রমহিলা বললেন, কি একা একা কথা বলছেন দাদা... ঘুমাতে দিন না...

Sourav Bhattacharya

রঞ্জন উঠে বসল। সুজনের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মরলেন কি করে? আসলে অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল করছে রঞ্জন, তার মধ্যে ভয়টা সরে গিয়ে মৃত্যুর উপর একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব হচ্ছে। এদিকে তো সব ছড়ানো, কুয়াশা কুয়াশা, ওদিকেও কি তাই?

সুজন বলল, মনে হয় হার্ট অ্যাটাক, কি সেরিব্রাল অ্যাটাক হবে, পোস্টমর্টেম হয়নি এখনও...

ট্রেন চলছে। বসে বসেই রঞ্জন কখন ঘুমিয়ে পড়েছে...ভোরের আলো ফুটল... সুজন নেই। রঞ্জন দেখল, তার পাশে একটা চিরকুটে একটা পাসওয়ার্ড আর নাম্বার লেখা। নীচে লেখা, আমি রাতে আসব, আমার খবরটা পেয়ে পারমিতা কাঁদল কিনা জানাবেন। আমার নিজের জানতে ভয় লাগছে। সেই যখন উচ্চমাধ্যমিক রেজাল্টটা বেরোলো...যাহ স্‌লা...আমার নামটাই নেই! আমার সেই আতঙ্কটা আবার হচ্ছে...

রঞ্জন টয়েলেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। তীব্র গতিতে ছুটছে চেন্নাই মেল। চিল্কা পেরোচ্ছে। দুটো বগির সংযোগস্থলে এসে দাঁড়ালো। নীচে লাইনটা চকচক করতে করতে ছুটে যাচ্ছে। দরজা খুলে লাফ দেবে? এই চিল্কায় কে খুঁজে পাবে? হঠাৎ বুকের ভিতর কান্না উঠল। নিজের অজান্তেই কখন অত শক্ত করে রডটা ধরে ফেলেছে বোঝেনি। একজন 'ইডলি বড়া, হাঁকতে হাঁকতে পাশ দিয়ে চলে গেল। কান ফেটে যাচ্ছে ট্রেনের চাকার শব্দে। জীবন মানে শব্দ। নিজের জন্য চোখের কোল উপচে জল এলো। একটা বাচ্চা সামনে দাঁড়িয়ে... আঙ্কেল মেরে হাত পাকড়োগে... মুঝে উস কোচ মে জানা হ্যায়... নানিকে পাস...

রঞ্জন হাতটা বাড়ালো। তার হাতের মধ্যে প্রবল বিশ্বাসে ধরা নরম খুদে হাত। রঞ্জনের নাকের কাছটায় অভিমানী কান্না এসে জমছে... ভালোবাসার কোনো অন্তিম স্টেশান হয় না... ভালোবাসা মানে নরম ঘাসে ঢাকা মাঠ... কে মরতে যায়... বালাইষাট!

Sourav Bhattacharya

কে তুমি?

কেবিনে ঢুকতেই চাঁপা বলল, মাসীমা আজ বমি করেছেন।

বিশাখা সোফায় বসতে বসতে এসিটা দু'দাগ কমিয়ে দিয়ে বলল, কিছু উল্টোপাল্টা খেয়েছে আজ?

মোচা... ছোলা দিয়ে.... আমায় ক'দিন জোর করছিলেন.... আমার কেমন মায়া লাগল.... আমি...

চাঁপার চোখে জল চলে এলো। বিশাখার রাগ হয় না আর। ক্লান্ত লাগে। চাঁপাকে বলল, বোস... আয়।

চাঁপা পাশে বসে মোবাইল অন্ করে বলল, দেখো দিদিভাই... কি আনন্দ করে মাসীমা খাচ্ছেন!

চাঁপা রেকর্ড করেছে। তার মা, অমন দুঁদে হেডদিদিমণি মা, যিনি কিনা আজীবন ছোঁয়াছুঁয়ি জাতপাত মেনে এসেছেন সে চাঁপার হাতে রান্না খাচ্ছে? সত্যিই কি ভালোবেসে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে মা।

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

বিশাখা চাঁপার দিকে তাকালো। সে উৎফুল্ল মুখে মোবাইলের দিকে তাকিয়ে। বিশাখা বলল, আমার মোবাইলে সেন্ড করে দে... দাঁড়া আমি হটস্পট অন করি... তুই মোবাইলটা আমায় দে.....

=====

বিশাখার বয়েস চল্লিশের কোটা পেরিয়েছে সদ্য। বিয়ে করেনি। আইটিতে কাজ করে। একা একটা ফ্ল্যাটে থাকে। মা থাকত বেলঘরিয়া। একাই। চব্বিশ ঘন্টা দেখাশোনার লোক থাকত যদিও। চার মাস আগে লিভার ক্যান্সার ধরা পড়ে।

আজ ঘুমাচ্ছে সারাদিন। ঘোর লেগে আছে যেন। আর সময় নেই বেশি। বিশাখা বুঝতে পারছে। রোজ অফিস থেকে আসার সময় ফুল কিনে আনে। মা ফুল ভালোবাসে কিনা জানেনি কোনোদিন। নিজের জন্য আনে। টেবিলে রাখা ফুলদানিতে সাজায়। নিজের ভালো লাগে। এত কাছে মৃত্যুকে বড় অসহ্য লাগে। মৃত্যু সব সময়েই যেন ইন্ট্রুডার।

মা কোনোদিন ফুলের দিকে তাকিয়েছে? মনে হয় না। বিশাখা কেবিনে এসেই আগে বেডশিটের দিকে তাকায়। তারপর মায়ের ড্রেসের দিকে। কোথায় ভিজে আছে কিনা, কোথাও ব্লাড আছে কিনা।

======

মা আর কথা বলেনি। বিশাখা সোফায় বসে বসে বই পড়েছে। মোবাইলে সিনেমা দেখেছে। টেক্সট করেছে। ইনস্টাগ্রামে ছবি দিয়েছে। মা পাশে। এই বোধটাকে বুকের মধ্যে বারবার জন্ম দিয়েছে। নাড়াচাড়া করেছে। বারবার মাথায় ঘুরে ফিরে এসেছে মায়ের বেডে বসে খাওয়ার দৃশ্যটা। মানুষ এমন হয়ে যায়? নিজের ব্যক্তিত্বের কিছুমাত্র রেশ থাকে না?

=====

ফাঁকা কেবিনটায় বসে। তখন মায়ের জ্ঞান ছিল। চাঁপা মাকে টয়েলেটে নিয়ে গেছে। মা বসতে চাইছে না কমোডে, চাঁপা বোঝাচ্ছে। বিশাখা মায়ের বেডে শুলো। আজ বাড়ি থেকে সোজা এসেছে। শাড়ি পরেছে। মায়েরই শাড়ী। পা'টা টানটান করে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে বিশাখা। মৃত্যুর আগে কিভাবে মানুষ? বিশাখার জীবনে তেমন কেউ নেই। চল্লিশের পর যে বন্ধুরা টিকে যায়,

Sourav Bhattacharya

তারা মোটামুটি টিকেই যায়, কোথাও পড়েছিল। যারা মতলবে এসেছিল, তারা নেই আর। মতলব ফুরিয়ে গেছে। বিশাখাও সরে এসেছে অনেকের কাছ থেকে। এই যে একা বেড়ে শুয়ে থাকা। সে যখন শুয়ে থাকবে? কে আসবে? কেউ এলেই কি ভালো লাগবে?

জুন মালহোত্রা, তার ইম্মিজিয়েট বস, তার এক মেয়ে লণ্ডনে পড়াশোনা করে। জুন বলে, আমি চাই একা মারা যেতে। আমি জানি আমার মেয়ে আসবে না। জুন ডিভোর্সি। এক্স হাসব্যান্ড অস্ট্রেলিয়ায়। আবার বিয়ে করেছে। উইকেণ্ডে ভিডিও কল করে। ছেলে আছে একটা। আশিষ। জুনের বাবার নাম।

সব ভীষণ প্রেডিক্টেবল হয়ে যায় একটা স্টেজের পর লাইফে। এক্সসেপ্ট ডেথ। বিশাখা শরীরটা ছেড়ে দিল। তুলোর মত। যেন সমর্পণ করছে কাউকে। কাকে? ঈশ্বর? নাকি ভবিতব্য? নাকি চিকিৎসকের হাতে? এক্সপেরিমেন্ট?

দিদি.....

মা তাকিয়ে আছে। তাকে চিনতে পারছে না। বিশাখা একটু এম্ব্যারাসড। চাঁপার চোখেমুখে বিস্ময়, হাসিও। বিশাখা সোফায় বসে শাড়িটা ঠিক করতে করতে বলল, হল?

না গো.... বসেই থাকল.... তোমায় চা এনে দেব?

বিশাখার চায়ের ইচ্ছা নেই। তাও এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটা কাটানোর জন্য বলল, বেশ, আনো। একটা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল।

======

চাঁপা চা আনতে গেল। মা তার দিকে তাকিয়ে বসে। চিনতে পারছে না। বিশাখাও মায়ের দিকে তাকিয়ে। কি ভাবছে মা? কি ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছে মানুষটা! বালিশটা মুখের উপর চেপে ধরলেই সবটা মিটে যায়। পটাশিয়াম সায়ানাইড দোকানে পাওয়া যায়? কেকের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেত। মায়ের কেক ভীষণ প্রিয়।

"তুমি কি হাসিদির মেয়ে?"

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

বিশাখা হাসিমাসিকে একবার দেখেছে। হাসি মাসি নিউজার্সিতে থাকে। থাকত। মারা গেছে। গলব্লাডার ক্যান্সার। হাসিদির মেয়ের নাম অ্যানা। হাসিদির বর ছিল ইউরোপিয়ান। অ্যানার মত দেখাচ্ছে তাকে? ভীষণ ওবিজ তো অ্যানা? ছি! মা!

না, আমি তোমার মেয়ে.... বিশাখা....

"আমার মেয়ে নেই... মারা গেছে.... গঙ্গায় ডুবে...."

বিশাখা চুপ করে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে। কথাগুলো উচ্চারণ করতে জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে মায়ের। জিভে ক্যান্সার হতে পারত, তবে তো আর কথাই বলতে পারত না। নি:শব্দ কেবিনে মা মেয়ে বসে থাকত। মৃত্যুর অপেক্ষায়। কেবিনে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ। মায়ের শরীর থেকে আসছে। মৃত্যু পথযাত্রীদের শরীরে এক ধরণের গন্ধ হয়। আগেও পেয়েছে। হাস্পাতালেই। কানটা চ্যাপ্টা হয়ে মাথার সঙ্গে মিশে যায়। নাকটা বেঁকে যায়। বিশাখা গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছে। কেউ হাত বাড়াচ্ছে একটা... কে? কে? সুকান্ত?

=======

চার বছর সম্পর্ক ছিল। এতদিন পর এসে ফিরে তাকালে শুধু শরীরের বোকামি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। শরীর সারা জীবন বোকা বানায় মানুষকে। শেষে মৃত্যুর হাতে একা ফেলে পালিয়ে যায়। মন তো বায়বীয়। থাকলেও কি, আর না থাকলেও। বুদ্ধি চিরকাল উদভ্রান্ত।

চাঁপা চা দিয়ে মোবাইলটা নিয়ে বাইরে গেল। ছেলের সঙ্গে কথা বলবে।

"ওটা কি? কফি?"

না, চা। খাবে?

"তোমার জাত কি? যার তার হাতে আমি খাই না"।

চোখ জুড়িয়ে আসছে মায়ের। ঘুমাবে। শুতে গেলে মাথাটা বেডের লোহায় ঠুকে যাবে। মৃতপ্রায় মানুষের মাথা ঠোকা নিয়ে কেউ ভাবে না। ঠুকে যাক মাথা। বিশাখা তবু উঠল না। চায়ে

Sourav Bhattacharya

চুমুক দিয়ে তাকিয়ে থাকল, অপলক। শ্বাস দ্রুত। মুখের পেশী শক্ত। কি করে মা, দেখবে। এই কেবিনে এর থেকে বেশি চেঞ্জ কি আশা করবে আর?

মাথা ঠুকল না। বালিশটার আন্দাজে মাথাটা ঠিক সরে এলো। বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

বিশাখার চোয়ালের পেশী নরম হল। চায়ের কাপটা পাশের টেবিলে রেখে মায়ের মাথার কাছে এসে দাঁড়ালো। ঘুমন্ত মানুষকে নিজের মত করে পাওয়া যায়। মাথায় হাত রাখল। চোখের কোলে জল জমে এলো। নাকের কাছে প্রাচীন এক কান্না। মা তুমি যাও। আমি ক্লান্ত। তুমি যাও। আমি একটু ঘুমাই।

======

মায়ের জিনিস কিছু নিয়ে নার্সিংহোম থেকে ফিরছে বিশাখা। মা আর কোনোদিন কথা বলবে না। ফোন করবে না। আর কোনো বৈধ বিরক্তি নেই জীবনে। ফোনে আর কোনো মিসডকলের চিহ্নকে নাড়ির উৎপাত বলে মনে হবে না। নাভিটা টাটাচ্ছে। বিশাখা নাভিতে হাত দিল টিশার্টের উপর দিয়ে। ফাঁকা। গভীর। ড্রাইভারকে বলল, আহেরিটোলার দিকে চলো।

আহেরিটোলার গঙ্গার ধার। রেললাইনের পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা। চওড়া না। বিশাখা একটা সিগারেট ধরিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দাঁড়ালো। এত বড় গ্রহটায় তার নিজের বলতে কোনো প্রাণী নেই আর। সব অতীত। একজন সম্পূর্ণ একা মানুষের গা হাত পা চোখ নাক মুখ সব থাকে। একাকীত্ব পোড়ায় না। ভাসায় না। আটকে রাখে। অদৃশ্য বাঁধনে আটকে রাখে। একা মানুষ নিজের কাছে নিজে আটকে যায়। নিজের কাছ থেকে নিজের ছুটি পাওয়া যায় না, যদি না কেউ বাইরে থেকে শিকল খুলে ডাকে। কে ডাকবে? শরীর জ্ঞানবৃদ্ধ এখন। সাড়া দেয় না, ভুরু কুঁচকায়। হৃদয়? আছ? বেঁচে? হাসির রেখা ফুটল। নিজেকে নিজে টিজ মানুষ ছাড়া কে করতে পারে?

সিগারেট শেষ। সন্ধ্যে নেমে আসছে। সামনে শিব মন্দিরে পুরোহিত ঢুকল। সকালের ফুল ফেলে নতুন করে সাজাচ্ছে। আরতি করবে। আরো কয়েকজন জড়ো হল। বিশাখা কয়েক পা এগিয়ে এলো। আস্তিকতায় না, কিছু জড়ো হওয়া মানুষের উষ্ণতা পেতে।

Sourav Bhattacharya

আরতি হল। ঘন্টা শাঁখ বেজে উঠল। কয়েকবার মায়ের মুখটা, শরীরটা ভেসে আসলো। মা পুজো দিচ্ছে। সে খাটে বসে অঙ্ক করছে। হলুদ ডুমের আলোয় মা এক মায়াবী শরীরে ভেসে আছে যেন।

নিন...

সামনে দাঁড়িয়ে পুরোহিত। হাতে জ্বলন্ত পঞ্চশিখা। মানুষই একমাত্র আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। সে-ই কবে। বিশাখা সঙ্কুচিত হয়ে বলল, আমার অশৌচ... মা চলে গেলেন...

পুরোহিত শুনতে পেলো না। বিশাখা উষ্ণ আশীষ দু হাতে নিল। কেউ যেন বাইরের শিকল ধরে টানল। বাইরে যাওয়ার রাস্তাও ভিতর থেকে, রবীন্দ্রনাথ। ডাকঘর। এ বিরাট সংসারে একাকীত্ব বলে কিছু হয় কি? সব নিয়েই সে। এই মাটিতেই মিশে যাবে একদিন। কোথাও মাথাটা নীচু করতে ইচ্ছা করল। কেউ শিকল ধরে টানছে। যাবে কি? নাকি এই বেশ। নাকি সবটাই ভ্রান্তি?

বিশাখার পা ডুবিয়ে গঙ্গার জলে। কেউ ছুঁয়ে থাকুক তাকে। কেউ একজন। বিশাখা চোখ বন্ধ করে বসে। কেউ ডাকবে না তাকে কোনোদিন, অদরকারে। তবু কেউ একজন ছুঁয়ে থাকুক। কে যেন ছুঁয়ে আছে।

কে তুমি?

Sourav Bhattacharya

ফিরে তাকালো না

বিকেল হল, উঠানে বসল। গরমে ভেপসে যাচ্ছে বুক, পেট, বগল, থাই। কাজল গলবে আর বেশিক্ষণ হলে। গয়নাগুলো টিকটিকির মত গায়ের উপর বসে।

প্রথম যে এলো, শ্বশুরের বন্ধু।

ঘর অন্ধকার। পাঞ্জাবির বোতাম খুলতে খুলতে বলল, থাক থাক, আলো জ্বালতে হবে না.... তুমি বরং পুকুরের দিকের জানলার একটা পাল্লা খুলে দাও। বাতাস আসুক।

জোছনা জানলাটা অল্প খুলল। পুকুরের ওপাড়ে বাচ্চাগুলো খেলছে, কেউ কেউ বাসন মাজতে বসেছে। ঘরের ভিতরটা আলোছায়া।

রতন খালি গা, ধুতিটা থাই অবধি তুলে চৌকিতে পা দুটো ঝুলিয়ে, হাতদুটো পিছনে দিয়ে, মাথাটা পিছনে ঝুঁকিয়ে হা হা করে আওয়াজ করছে। যেন মাছ খাবি খাচ্ছে একটা। রতন ওভাবেই বলল, দাঁড়িয়ে কেন, বসো.... পাশে বসো....

Sourav Bhattacharya

জোছনা বসল। গায়ের গয়নাগুলো খুলে ফেলল। শাড়িটাও উপর থেকে সরিয়ে পাশে ফেলে রাখল। ব্লাউজের উপর দুটো নীল সুতোর ফুল আঁকা। তার উপর জানলা থেকে আলো এসে পড়েছে। জানলায় এসে বসল একটা চড়াই।

=====

রতন হাত রাখল জোছনার হাতের উপর। শীর্ণ উষ্ণ হাত। রতন বলল, আমার এ বয়সে ওসবের কোনো ক্ষমতা নেই। তবু আমাদের পাড়ায় তুমি প্রথম নও, জানোই তো... তুমি তো তাও অনেক দেরি করে আঁচল খসালে... কতজনের ঘর ভরে উঠল কম বয়সেই...

জোছনা জানলার বাইরে তাকিয়ে। ঘরের মধ্যে মন বসছে না। এ পাড়াতেই মন বসেনি কোনোদিন।

এ পাড়ার বেশিরভাগ বাড়িতে বউরা, মেয়েরা বাজি বানায়। পুরুষেরা বেশিরভাগ মাতাল। রিকশা নামমাত্র চালায় কেউ কেউ। কেউ কেউ মদের ঠেকে রাতদিন কাটিয়ে দেয়। যে ক'জন পুরুষমানুষ ব্যবসা করে, এদিক ওদিক করে টাকা করেছে তারাই এ চল শুরু করেছে। তবে কড়া নিয়ম, পাড়ায় অন্য পুরুষ ঢোকার নিয়ম নেই। যা হবে নিজেদের মধ্যেই।

=====

রতনের চালের ব্যবসা। তার বাড়িতে আসা যাওয়া শ্বশুরের আমল থেকেই। শ্বশুর ছিল জাত মাতাল। তার ছেলেও। আগে ভ্যান চালাত। গত দু'মাস আগে ভ্যান বিক্রি করে দেড় হাজার টাকাও পাওয়া গেল না। শাশুড়ি বলল, কাজে যখন নামবে তখন রতনদাকে বলি। ভালো মানুষ। আমায় বেশি খাটতে হয়নি। তবু হাবু কিন্তু তোমার শ্বশুরের। তুমি ও নিয়ে মনে সন্দেহ রেখো না। ও আসুক। তুমি বসো দাওয়ায়।

=====

রতন নাক ডাকছে। জোছনা শাড়িটা গুটিয়ে হাঁটুর উপরে তুলে, মাথাটা হাঁটুর উপর রেখে বসে। এ ঘরে পাখা নেই। পুকুরটা বড়। পুকুরের জল মাখা হাওয়া আসছে। বড় শরীরে অনেক জল। পুকুর, বারোভাতারি।

Sourav Bhattacharya

এ পাড়ায় এ চল দেখে জোছনা প্রতিজ্ঞা করেছিল সে যাই হোক, গলায় দড়ি দেবে, কিন্তু এ রাস্তায় নামবে না। কিন্তু সব গুলিয়ে দিল বেণী। স্কুলে যায়। ভালো পড়াশোনায়। নাইনে উঠল। মাধ্যমিকটা দেওয়াতেই হবে। যতদূর চায় পড়ুক। রতনকে সেই কথাটাই বলতে চায় জোছনা, সে যা চায় করুক, কিন্তু মেয়েটার ভার নিক। কিন্তু রতন।

রতন কুঁকড়ে শুয়ে। যেন মায়ের গর্ভের কথা মনে পড়ছে। বেণীকে বিয়ে দেবে না। বলবে চাকরি কর। তারপর এ পাড়া থেকে বার করে দিয়ে জোছনা মরবে। এ ঘরেই গলায় দড়ি দেবে। কিম্বা এই পুকুরেই ডুবে মরবে।

=====

শাশুড়ির শাঁখের আওয়াজে ঘুম ভাঙল রতনের। অন্ধকার হয়ে গেছে ঘর। রতন উঠেই বলল, আমি কোথায়... ওহ্... বড় শ্যামলের বাড়ি.... তুমি কোথায়....

জোছনা হাতটা বাড়িয়ে দিল। রতন হাতটা ধরে হাতড়াতে হাতড়াতে জোছনার বুকের উপর হাত রাখল। বলল, খোলোনি।

জোছনা বলল, আপনি ঘুমাচ্ছিলেন...খুলছি....

থাক থাক... সন্ধ্যে হল, বাড়ি গিয়ে আহ্নিক আছে.... তোমার শাশুড়িকে ডেকে দিয়ে তুমি যাও.... আমি ওর হাতেই টাকাটা দিয়ে দেব।

=====

জোছনা বসেনি এরপর ক'দিন দাওয়ায়। শাশুড়ির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। বেণীর পড়াশোনা তার শাশুড়ির চোখে যেন বিষ। তাকে, তার মেয়েকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগাল করে। জোছনা মেয়ে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। কোনো গাছতলায় বসে থাকে, কি শিবমন্দির তলায় বসে থাকে। সংসার চালানোর জন্য বাজি বানানো তো আছে, বড়জোর তার এই বাড়তি উপার্জনের সামান্য কিছু দিতে পারে, মাছ বা ডিমের জন্য সপ্তাহে একদিন কি দু'দিনের জন্য... কিন্তু সব টাকাটা কিছুতেই নয়।

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

শাশুড়ি রাজি হল অবশেষে। চারদিন ছেলে বাড়ি এলো না। শাশুড়ি বলল, থানায় যাব। জোছনা বলল, ওর জন্য শ্মশান ছাড়া কোথাও যাব না মা....

শাশুড়ি বলল, না ফিরলে বডি পাবি?..... আগে খুঁজি চল....

জোছনা বলল, বারো বছর না ফিরলে এমনিই মানুষ মরে গেছে ধরে নেয়.... কাজ করে নেব.... সবে তো চারদিন।

শাশুড়ি কথা বাড়ায়নি। রতন আর আসেনি। জোছনার বরও আর ফেরেনি। দু'সপ্তাহ হলে শাশুড়ি বলল, সব শর্তে রাজী।

জোছনা বসল দাওয়ায়। সেদিন এলো বগা। মোবাইল সারানোর দোকান করেছে চৌমাথায়। ভালো চলে। তার বয়েস বেণীর চাইতে পাঁচ কি ছ'বছর বড় হবে।

ঘরে ঢুকেই হামলে পড়ল। কোমর জড়িয়ে, গাল কামড়িয়ে বলল, কতবার স্বপ্ন দেখেছি তোকে.... ল্যাংটো....

বাইরের পুকুরে কেউ ঝাঁপ দিল গাছ থেকে। কোনো বাড়ির ছেলেই হবে। এ এক খেলা। কত খেলা সংসারে আছে। শরীর নিয়ে। মন তো ঝুলের মত, অল্প বাতাসে দোলে, বেশি বাতাসে ছেঁড়ে। জোছনার মন নেই। মেয়ে আছে। আর মেয়েকে বাঁচানো, নিজেকে বাঁচানো আছে। নিজেকে বাঁচানো মানে তো পেট। যেখানে জিভ বোলাচ্ছে ছেলেটা। জোছনা স্বপ্ন দেখছে তার বরকে পুড়িয়ে ফিরছে সে। ঘরে ঢুকে নিমের পাতা কাটছে মুখে। তিতা।

=====

বেণী পালালো। চিঠি লিখে। চিঠি পড়াতে জোছনা গেল রতনের দোকানে। কলেজের এক ছেলের কাকার সঙ্গে পালিয়েছে। সে ব্যবসা করে লক্ষ্মৌতে। জানে জোছনা ছাড়বে না, ছেলেটার বাড়িতেও রাজী নয়। তাই তারা পালিয়েছে।

জোছনা ক'দিন ধরে মরার কথা ভাবল। এর মধ্যে সত্যিই সে বিধবা হয়েছে। তার বরের পচা শরীর রেললাইনের ধার থেকে পাওয়া গেছে। কুকুর-শেয়ালে খাওয়া। শাশুড়ির মাথাটা খারাপ

Sourav Bhattacharya

হয়েছে। বাড়ি ফেরে না। রতনের দোকানের সামনে বসে থাকে আর বিড়বিড় করে কি সব বলে যায়। রতনের বাড়ির লোক বাসি রুটি, ভাত দেয়, কখনও খায়, কখনো খায় না। জোছনার শাশুড়িকে দেখলে কান্না পায়।

একবার মুষলধারে বৃষ্টি। জোছনা ছাতা আর একটা শাড়ি নিয়ে ছুটল রতনের দোকানের দিকে। গিয়ে দেখে তার শাশুড়িকে রতন একটা বস্তা টাঙিয়ে বসার জায়গা করে দিয়েছে। কিন্তু সে রাস্তায় উবু হয়ে বিড়বিড় করে বকেই যাচ্ছে।

জোছনা ছাতা মাথায় শাশুড়ির সামনে দাঁড়ালো। রতন ইশারা করে দেখালো, মাথাটা পুরো গেছে, তুমি বাড়ি যাও, আমি আছি।

সবটা ইশারায় বলল রতন। জোছনা বুঝল। সংসারের সব আসল কথা ইশারাতেই তো হয়। ঈশ্বর মানেও তো ইশারা।

=====

জোছনা মরবার কথা আর ভাবে না। একদিন গভীর রাতে হিসি করতে উঠে তার মনে হল সে বাঁচবে। এক আকাশ তারার সামনে যখন সে পুকুরধারে বসে, পুকুরের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ছায়া, তারার ছায়া, এরা সবাই বসে তার মরণ দেখবে বলে? সে বাঁচবে।

ক'দিন রোজ বাজারে গেল। প্রথমে ভেবেছিল কাজ চাইবে। কিন্তু দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই মন বলত, না না, অন্য কিছু ভাব জোছনা। কি করবে? বড়ি বানাবে? বিড়ি বাঁধবে? স্টেশানে বসে বসে চা আর একটা বাপুজী কেক খেতে খেতে মাথায় হাজার একটা ভাবনা আসছে। কি করবে? হঠাৎ পাশে দেখে তার মত একজন বউ ফুচকা বিক্রি করছে। ব্যস, মাথায় গিঁথে গেল। সে বউয়ের নাম রমা। তার বরের শরীর একদিক পড়ে গেছে। আগে সে-ই বেচত। এখন সে ভার নিয়েছে। জোছনা রমার বাড়ি যাতায়াত শুরু করল। ফুচকা বানানো শিখল। রমা তাকে টাকা ধার দিল। বলল, দিদি তুমি নিজে দোকান করো।

=====

Sourav Bhattacharya

বেঁচে থাকার গল্প

বাড়ির সামনে ফুচকার দোকান করেছে। তিন বছর শরীরের উপর যারা রগড়েছে তারা আসে না। এ পাড়ারই সব। তবু আসে না। তাদের বাড়ির লোকেরা আসে। ফাউ ফুচকা চায়। জোছনা দেয়। আবার দেয়ও না। তার দেখাদেখি আরো কয়েক বাড়ি ফুচকার দোকান দিয়েছে। লাভের মুখ দেখছে পরিবারগুলো। বউগুলো সুখী হোক। মেয়েগুলো সুখী হোক। প্রতি বছর শিবরাত্রিতে আগে তার ডাক পড়ে এখন এ পাড়ায়। রমাও আসে।

জোছনা এখন অনেক কিছু ভাবে। বেণীর কথা ভাবে। বেণী ফোন করে। জোছনা স্মার্টফোন কিনেছে। বেণীর ছেলের সঙ্গে কথা বলে। নাতি বলে, নাচ দিখাও। জোছনা বলে ওরে মিনসে। নাতি হেসে লুটিয়ে পড়ে। জোছনা গান চালিয়ে নাচ প্র্যাক্টিস করে। নাতিকে দেখায়। মেয়ে বলে, তোমার বয়েস কমছে, না বাড়ছে মা!

=====

শাশুড়ি মারা গেল রাস্তাতেই। রাতে। জোছনা দাহ করে এসে এমন কাঁদল, সারা পাড়ার মেয়ে-বউ কেউ সান্ত্বনা দিতে পারল না। জোছনা সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দরজা দিয়ে শাশুড়ির ঘরে শুয়ে ছটফট করে কাঁদল। যেন এ পাড়ার সব বউ, মা, শাশুড়ির জন্মজন্মান্তরের কান্না সে একা কাঁদছে।

সেদিন অনেক রাতে রতন এলো। জোছনার হাতদুটো ধরে বসে থাকল। ফোঁপালো। কিন্তু শরীরে কান্নার শক্তি নেই।

জোছনা ভোরবেলা রতনকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে গেল। রতন কাঁপা কাঁপা হাতটা তার বাড়ির সামনে এসে জোছনার মাথায় রেখে বলল, আমার আশীর্বাদ করার অধিকার নেই মা.... তবু বলি তোমার মাকে আমি সত্যিই ভালোবাসতাম.... আর....

জোছনা বলল, আমি জানি, মা পাগল হয়ে সবাইকে ভুলল... আপনাকে না.... এ ভালোবাসা না থাকলে....

জোছনা কথা শেষ করতে পারল না। কান্নার তোড়ে গলা চেপে গেল। মাথাটা নীচু করে বলল, আমি আসি বাবা.....

Sourav Bhattacharya

পিছন ফিরে তাকালো না আর। মানুষের পাপপুণ্যর হিসাব জোছনা করে না। সবাই ভালো থাকুক। এর বেশি কিছু চায় না। ঈশ্বর সে অধিকার দেয়নি কাউকে। জোছনা জানে। ইশারায় বলেছেন তাকে, মহাদেব।

Sourav Bhattacharya

লেখক পরিচিতি

জন্ম ১৯৭৬। হাওড়ার সালকিয়ায়। বর্তমান নিবাস হালিশহরে। বিজ্ঞানের স্নাতক। পেশা শিক্ষকতা।

সাহিত্য জীবন শুরু কবিতা দিয়ে। তারপর গল্প, প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমন্বয় ঘটান, যার ফলস্বরূপ এই প্রথম প্রকাশিত হতে চলেছে তার অনুগল্পের সংকলন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতা। এছাড়াও তার লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, লিটল ও ওয়েব ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রিয় বিষয় দর্শন ও মনোবিজ্ঞান, এবং সেই বিষয়কে কেন্দ্র করেই তার পড়াশোনা এগিয়ে চলেছে সর্বস্তরে ও সর্ববিষয়ে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি হলেও তলস্তয়, দস্তয়েভস্কির হাত ধরে কাম্যু, মার্কেজ পর্যন্ত করেছেন অবাধ বিচরণ। আর তাই জীবনে জীবন যোগ করার কাজ করে চলেছেন লেখনীর মাধ্যমে আর পাঠককে এক জীবনে অনেক জীবন যাপন করাচ্ছেন প্রতিটা শব্দের অভ্যন্তরস্থ অনুভূতির মধ্যে দিয়ে, সেতু বাঁধছেন লেখকে-পাঠকে।

বেঁচে থাকার গল্প

‘বেঁচে থাকার গল্প’ আসলে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ফেরার গল্প। আশার গল্প। জীবনকে হতাশায় ডুবে না যেতে দেওয়ার গল্প। ঘন অন্ধকারে একমুঠো জোনাকির মত রাখলাম।